শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ—১৩৪২
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন—১৩৫২
তৃতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ—১৩৬২

ছয়টি গল্প এই সংগ্রহে নিবেশিত হইল। সবগুলিই মাসিক পত্রিকাদিতে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'রক্ত-সন্ধ্যা'য় ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্র সম্পূর্ণ ইতিহাসসম্মত, কোথাও রং চড়াইবার চেষ্টা করি নাই। যাঁহারা এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিটির সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে উৎসুক তাঁহারা ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের অমূল্য পুস্তক 'ফিরিঙ্গি-বণিক' পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

এই গল্পে 'ফিরিঙ্গি' শব্দ মূল অর্থে (Frank = ফিরিঙ্গি = য়ুরোপীয় যে কোন জাতি) ব্যবহৃত হইয়াছে; বর্তমান কোনও সম্প্রদায় বিশেষকে কটাক্ষ করা হয় নাই। বলা বাহুল্য, যে-সময়ের গল্প সে-সময়ে উক্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না।

'চুয়াচন্দনের' একটি ঘটনার জন্য বিদ্যাপতি ঠাকুরের নিম্নোদ্ধৃত পদটির নিকট আমি ঋণী—

'তহি পুন মোতি-হার টুটি পেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি কেল॥'

'রক্ত-খদ্যোত' গল্পের শেষ কয়েক পংক্তির ভাবাংশ সার্ আর্থার কোনান্ ডয়েলের একটি গল্প হইতে গৃহীত হইয়াছে, অন্যথা গল্পটি মৌলিক।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

এই গল্পগ্রন্থটিতে 'দেখা হবে' নামে আর একটি গল্প সন্নিবেশিত হইল।

প্রকাশক

সূচী

চুয়াচন্দন

চুয়াচন্দন

একদিন গ্রীষ্মের শেষভাগে, সূর্য মধ্যাকাশে আরোহণ করিতে তখনও দণ্ড তিন-চার বাকি আছে, এমন সময় নবদ্বীপের স্নানঘাটে এক কৌতুকপ্রদ অভিনয় চলিতেছিল।

ভাগীরথীর পূর্বতটে নবদ্বীপ। স্নানের ঘাটও অতি বিস্তৃত—এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে। ঘাটের সারি সারি পৈঠাগুলি যেমন উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত, তেমনি প্রত্যেকটি পৈঠা প্রায় সেকালের সাধারণ রাজপথের মতো চওড়া। গ্রীষ্মের প্রখরতায় জল শুকাইয়া প্রায় সব পৈঠাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দু'এক ধাপ নামিলেই নদীর কাদা পায়ে ঠেকে। স্নানের ঘাট যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে বাঁধানো খেয়াঘাট আরম্ভ। তথায় খেয়ার নৌকা, জেলে-ডিঙ্গি, দুই-একটা হাজারমণি মহাজনী ভড় বাঁধা আছে। নৌকাগুলির ভিতরে দৈনিক রন্ধনকার্য চলিতেছে,—ছই ভেদ করিয়া মৃদু মৃদু ধূম উত্থিত হইতেছে।

বহুজনাকীর্ণ স্নান-ঘাটে ব্যস্ততার অন্ত নাই। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। ঘাটের জনতাকে সমগ্রভাবে দর্শন করিলে মনে হয়, মুণ্ডিতশীর্ষ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ও প্রৌঢ়-বৃদ্ধা নারীর সংখ্যাই বেশি। ছেলে-ছোকরার দলও নেহাৎ কম নয়; তাহারা সাঁতার কাটিতেছে, জল তোলপাড় করিতেছে। নারীদের স্নানের জন্য কোনও পৃথক ব্যবস্থা নাই, যে যেখানে পাইতেছে সেখানেই স্নান করিতেছে। তরুণী বধূরা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া টুপ্ টুপ্ ডুব দিতেছে। পর্দা প্রথা বলিয়া কিছু নাই বটে, তবু অবগুণ্ঠন দ্বারা শালীনতা-রক্ষার একটা চেষ্টা আছে; যদিও সে-চেষ্টা তনু-সংলগ্ন সিক্তবস্ত্রে বিশেষ মর্যাদা পাইতেছে না। সেকালে বাঙালী মেয়েদের দেহলাবণ্য

গোপন করিবার সংস্কার বড় বেশি প্রবল ছিল না ; গৃহস্থ-কন্যাদের কাঁচুলি পরিবার রীতিও প্রচলিত হয় নাই।

যে যুগের কথা বলিতেছি, তাহা আজ হইতে চারি শতাব্দীরও অধিক-কাল হইল অতীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আমাদের ঊর্ধ্বতন পঞ্চদশ পুরুষ সে সময় জীবিত ছিলেন। তখন বাংলার ঘোর দুর্দিন যাইতেছিল। রাজশক্তি পাঠানের হাতে ; ধর্ম ও সমাজের বন্ধন বহু যুগের অবহেলায় গলিত রজ্জু-বন্ধনের ন্যায় খসিয়া পড়িতেছে। দেশও যেমন অরাজক, সমাজও তেমনি বহুরাজক। কেহ কাহারও শাসন মানে না। মৃত বৌদ্ধধর্মের শবনির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস বামাচার উত্থিত হইয়াছে—তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঙালী অন্ধ-মত্ততায় অধঃপথের পানে স্খলিতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল অনাচার চলিয়াছে, তাহার কোনও নিষেধ নাই। কে কাহাকে নিষেধ করিবে ? যাহারা শক্তিমান্, তাহারাই উচ্ছৃঙ্খলতায় অগ্রবর্তী। মাতৃকাসাধন, পঞ্চ-মকার উদ্দাম নৃত্যে আসর দখল করিয়া আছে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চা দেশ হইতে যেন উঠিয়া গিয়াছে।

তখনও স্মার্ত রঘুনন্দন আচারকে ধর্মের নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া সমাজের শোধন-সংস্কার আরম্ভ করেন নাই। কাণভট্ট রঘুনাথ মিথিলা জয় করিয়া ফিরিয়াছেন বটে, কিন্তু নবদ্বীপে সরস্বতীর পীঠ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নদের নিমাই তখনও ব্যাকরণের টোলে ছাত্র পড়াইতেছেন ও নানাপ্রকার ছেলেমানুষী করিতেছেন। তখনও সেই হরিচরণস্রুত প্রেমের বন্যা আসে নাই—বাঙালীর ক্লেদকলুষিত চিত্তের বহু শতাব্দী সঞ্চিত মলামাটি সেই পূত প্রবাহে ধৌত হইয়া যায় নাই।

১৪২৬ শকাব্দের প্রারম্ভে এক কৃষ্ণা চতুর্দশীর পূর্বাহ্ণে বাংলার কেন্দ্র

নবদ্বীপের ঘাটে কি হইতেছিল, তাহাই লইয়া এই আখ্যায়িকার আরম্ভ।

ঘাটে যে সকলেই স্নান করিতেছে, তাহা নয়। এক পাশে সারি সারি নাপিত বসিয়া গিয়াছে; বহু ভট্টাচার্য গোঁসাই গলা বাড়াইয়া ক্ষৌরী হইতেছেন। বুরুজের গোলাকৃতি চাতালে একদল উলঙ্গপ্রায় পণ্ডিত দেহে সবেগে তৈলমর্দন করিতে করিতে ততোধিক বেগে তর্ক করিতেছেন। বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা হইতে সর্ববিদ্যায় পারংগম হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর হইতে নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু বিদ্যা তখনও হৃদয়ে আসন স্থাপন করেন নাই; তাই বাঙালী পণ্ডিতের মুখের দাপট কিছু বেশী ছিল। শাস্ত্রীয় তর্ক অনেক সময় আঁচড়া-কামড়িতে পরিসমাপ্তি লাভ করিত।

তৈল-মসৃণ পণ্ডিতদের তর্কও ন্যায়শাস্ত্রের সীমানা ছাড়াইয়া অরাজকতার দেশে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল। এক জন অতি গৌরকান্তি যুবা—বয়স বিশ বছরের বেশি নয়—তর্ক বাধাইয়া দিয়া, পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের বিতণ্ডা শুনিতেছিল ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। তাহার ঈষদরুণ আয়ত চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও কৌতুক এক সঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল।

জলের কিনারায় বসিয়া কেহ কেহ পায়ে ঝামা ঘষিতেছিল। নারীরা বস্ত্রাবরণের মধ্যে ক্ষার-খৈল দিয়া গাত্র মার্জনা করিতেছিল। কয়েকজন বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ আবক্ষ জলে নামিয়া পূর্বমুখ হইয়া আহ্নিক করিতেছিলেন।

এই সময় দক্ষিণ দিকে গঙ্গার বাঁকের উপর দুইখানি বড় সামুদ্রিক নৌকা পালের ভরে উজান ঠেলিয়া ধীরে ধীরে নবদ্বীপের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল—অধিকাংশ স্নানার্থীর দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল।

সমুদ্রযাত্রী বাণিজ্যতরীদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; প্রতি সপ্তাহেই দুটি একটি করিয়া ফিরিতেছিল।

ক্রমে নৌকা দুটি খেয়ার ঘাটে গিয়া ভিড়িল। মধুকর ডিঙ্গার ছাদের উপর একজন যুবা দাঁড়াইয়া পরম আগ্রহের সহিত ঘাটের দৃশ্য দেখিতেছিল ; পাল নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেও তীরে অবতরণ করিবার জন্য ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

বড় নৌকা ঘাটের নিকট দিয়া যাইবার ফলে জলে ঢেউ উঠিয়া ঘাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ; অনেক ছেলে-ছোকরা কোমরে গামছা বাঁধিয়া ঢেউ খাইবার জন্য জলে নামিয়াছিল। ঢেউয়ের মধ্যে বহু সন্তরণকারী বালকের হস্তপদসঞ্চালনে ঘাট আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ তীর হইতে একটা 'গেল গেল' রব উঠিল। যে গৌরকান্তি যুবাটি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তর্করত পণ্ডিতদের রঙ্গ দেখিতেছিল, সে দুই লাফে জলের কিনারায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ?"

কয়েকজন সমস্বরে উত্তর দিল, "কানা-গোঁসাই এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করছিলেন, হঠাৎ তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। ভাবে-ভোলা মানুষ, হয়তো নৌকোর ঢেউ লেগে তলিয়ে গেছেন।

যুবা কোমরে গামছা বাঁধিতে বাঁধিতে শুনিতেছিল, আদেশের স্বরে কহিল, "তোমরা কেউ জলে নেমো না, তাহ'লে গণ্ডগোল হবে। আমি দেখছি।"—বলিয়া সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মকালে ঘাটে স্নান করা ভাবে-ভোলা মানুষদের পক্ষে সর্বদা নিরাপদ নয়। কারণ, জলের মধ্যে দুই ধাপ সিঁড়ি নামিয়াই শেষ হইয়াছে—তার পর কাদা। এখানে বুক পর্যন্ত জলে বেশ যাওয়া যায়, কিন্তু আর এক পা অগ্রসর হইলেই একেবারে ডুবজল। যুবক জলে ঝাঁপ দিয়া কয়েক হাত সাঁতার কাটিয়া গেল, তার পর অথৈ জলে গিয়া ডুব দিল।

কিছুক্ষণ তাহার আর কোনও চিহ্ন নাই। ঘাটের ধারে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। সকলের মুখেই উদ্বেগ ও আশঙ্কার ছায়া। কয়েকজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ক্রন্দন-করুণ স্বরে হা-হুতাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

পঞ্চাশ গুণিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ পরে যুবকের মাথা জলের উপর জাগিয়া উঠিল। সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল—কিন্তু পরক্ষণেই আবার নীরব হইল। যুবক নিমজ্জিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, সে বারকয়েক সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া আবার ডুব দিল।

এবারও সমধিক কাল ডুবিয়া থাকিয়া সে আবার উঠিল; একবার সজোরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া এক হাতে সাঁতার কাটিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইল।

সকলে সচিৎকারে প্রশ্ন করিল, "পেয়েছ? পেয়েছ?"

যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বলতে পারি না। তবে এক মুঠো টিকি পেয়েছি।"

যুবক যখন তীরে আসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার বামমুষ্টি এক গুচ্ছ পরিপুষ্ট শিখা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে এবং নিমজ্জিত পণ্ডিতের দেহসমেত মুণ্ড উক্ত শিখার সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে।

কিয়ৎকাল শুশ্রূষার পর পণ্ডিতের চৈতন্য হইল। তিনি কিছু জল পান করিয়াছিলেন, তাহা উৎক্ষিপ্ত হইবার পর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। যুবক সহাস্য-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "শিরোমণি মশায়, বলুন দেখি বেঁচে আছেন, না মরে গেছেন? আপনার নব্য ন্যায়শাস্ত্র কি বলে?"

শিরোমণি একচক্ষু দ্বারা কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "কে—নিপাতনে সিদ্ধ? ডুবে গিয়েছিলুম—না?

তুমি বাঁচালে ?” যুবককে শিরোমণি মহাশয় ‘নিপাতনে সিদ্ধ’ বলিয়া ডাকিতেন। একটু ব্যাকরণের খোঁচাও ছিল ; কূটতর্কে অপরাজেয় শক্তির জন্য সমাদরমিশ্রিত স্নেহও ছিল।

নিপাতনে সিদ্ধ হাসিয়া বলিল, “বাঁচাতে পেরেছি কি না, সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি। যদি বেঁচে থাকেন, ন্যায়ের প্রমাণ দিন।”

কাণভট্ট ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। এইমাত্র মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শরীরে বল নাই ; কিন্তু তাঁহার এক চক্ষুতে প্রাণময় হাসি ফুটিয়া উঠিল ; তিনি বলিলেন, “প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। আমি বেঁচে আছি—এ কথা স্বয়ংসিদ্ধ। আমি বেঁচে নেই, এ কথা যে বলে, সে তৎক্ষণাৎ প্রমাণ করে দেয় যে, সে বেঁচে আছে। বাজিকর যত কৌশলী হোক্, নিজের স্কন্ধে আরোহণ করতে অক্ষম ; মানুষ তেমনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না।”

নৈয়ায়িকের কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল। নিপাতনে সিদ্ধ বলিল, “যাক, তাহ’লে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।—এখন উঠতে পারবেন কি ?”

শিরোমণি তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, “হঠাৎ হাতে পায়ে কেমন খিল ধরে গিয়েছিল। নিপাতন, তুমিই জল থেকে টেনে তুলেছ, না ?”

নিপাতন বলিল, “উঁহুঁ। আপনাকে টেনে তুলেছে আপনার প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের বিজয়-নিশান।”

“সে কি ?”

“আপনার নধর শিখাটিই আপনার প্রাণদাতা। ওটি না থাকলে কিছুতেই টেনে তুলতে পারতাম না।”

“জ্যাঠা ছেলে।”

"আপনার পৈতে ছুঁয়ে বলছি—সত্যি কথা।—কিন্তু সে যা হোক্, একলা বাড়ি ফিরতে পারবেন তো ?"

"পারব, এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি"—তার পর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বিশ্বম্ভর, এত দিন জানতাম তুমি নিপাতনেই সিদ্ধ, কিন্তু এখন দেখছি প্রাণদানেও তুমি কম পটু নও। আশীর্বাদ করি, এমনি ভাবে মজ্জমানকে উদ্ধার করেই যেন তোমার জীবন সার্থক হয়।"

নিপাতন হাসিয়া বলিল, "কি সর্বনাশ! শিরোমণি মশাই, ও আশীর্বাদ করবেন না। তাহ'লে আমার ব্যাকরণ-টোলের কি দশা হবে ?"

ও-দিকে নৌকার মালিক যুবকটি এ-সব ব্যাপার কিছুই জানিতে পারে নাই। সে নগর-ভ্রমণের উপযুক্ত সাজসজ্জা করিয়া ঘাটে নামিল। স্নান-ঘাটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, এক অতি গৌরকান্তি সুপুরুষ যুবা একজন মধ্যবয়স্ক একচক্ষু ব্যক্তির সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। এই গৌরাঙ্গ যুবকের অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়াছে; সিংহল, কোচিন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ—কোথাও যাইতে তাহার বাকি নাই। কিন্তু এমন অপরূপ তেজোদীপ্ত পুরুষমূর্তি আর কখনও দেখে নাই।

একজন জেলে মাঝি নিজের ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে বসিয়া জাল বুনিতেছিল, যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু, ঐ লোকটি কে জানো ?"

জেলে একবার চোখ তুলিয়া বলিল, "ঐ উনি ? উনি নিমাই পণ্ডিত।"

যুবক ভাবিল—পণ্ডিত! এত অল্প বয়সে পণ্ডিত! যুবকের নিজের পাণ্ডিত্যের সহিত কোনও সুবাদ ছিল না। সে বেনের ছেলে, বুদ্ধির বলেই সাত সাগর চষিয়া সোনাদানা আহরণ করিয়া আনিয়াছে। সে

আর একবার নিমাই পণ্ডিতের অনিন্দ্য দেহকান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃষ্টচিত্তে নগর পরিদর্শনে বাহির হইল।

বেনের ছেলের নাম চন্দনদাস। বেশ সুশ্রী চোখে-লাগা চেহারা; বয়স একুশ-বাইশ। বুদ্ধিমান, বাক্‌পটু, বিনয়ী—বেনের ছেলের যত প্রকার গুণ থাকা দরকার, সবই আছে; বরং দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া নানাজাতীয় লোকের সহিত মিশিয়া আরও পরিমার্জিত হইয়াছে। বেশভূষাও ঘরবাসী বাঙালী হইতে পৃথক। পায়ে সিংহলী চটি, পরিধানে চাঁপা রঙের রেশমী ধুতি মালসাট করিয়া পরা; স্কন্ধে উত্তরীয়। দুই কানে হীরার লবঙ্গ; মাথার কোঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে—মাঝখানে সিঁথি। গলায় সোনার হার বণিক্‌পুত্রের জাতি-পরিচয় দিতেছে।

চন্দনদাস অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ সওদাগর রূপচাঁদ সাধুর পুত্র। রূপচাঁদ সাধুর বয়স হইয়াছে, তাই এবার নিজে না গিয়া উপযুক্ত পুত্রকে বাণিজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। এক বৎসর নয় মাস পরে ছেলে বিলক্ষণ দু'পয়সা লাভ করিয়া দেশে ফিরিতেছে। বহুদিন একাদিক্রমে নৌকা চালাইয়া মাঝি-মাল্লারা ক্লান্ত; তাই একদিনের জন্য চন্দনদাস নবদ্বীপে নৌকা বাঁধিয়াছে। কাল প্রভাতেই আবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবে।

চন্দনদাস হরষিত-মনে গঙ্গাঘাটের পথ ধরিয়া নগর দর্শনে চলিল। সে-সময় নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিল। পথে পথে নাটশালা, পাঠশালা, চূর্ণ-বিলেপিত দেউল, প্রতি গৃহচূড়ায় বিচিত্র ধাতু-কলস, প্রতি দ্বারে কারু-খচিত কপাট; বাজারের এক বিপণিতে লক্ষ তঙ্কার সওদা কেনা যায়। পথগুলি সংকীর্ণ বটে, কিন্তু তাহাতে নগরশ্রী আরও ঘনীভূত

হইয়াছে। রাজপথে বহু লোকের ব্যস্ত যাতায়াত নগরকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

অনায়াস-মন্থরপদে চন্দনদাস চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছিল ; কিছুদূর যাইবার পর একটি জিনিস দেখিয়া হঠাৎ তাহার বাইশ বছরের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল ; সে পথের মাঝখানেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। বেচারা চন্দনদাস সাত সাগর পাড়ি দিয়াছে, কিন্তু সে বিদ্যাপতির কাব্য পড়ে নাই—'মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল'—এরূপ ব্যাপার যে সম্ভবপর, তাহা সে জানিত না। বিদ্যাপতি জানা থাকিলে হয়তো ভাবিতে পারিত—

অপরূপ পেখলুঁ রামা
কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।

কিন্তু চন্দনদাস কাব্যরসবঞ্চিত বেনের ছেলে, আত্মবিস্মৃতভাবে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। প্রভাতে সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল কে জানে, কিন্তু আজ তাহার সুন্দর মুখ দেখিবার পালা।

যাহাকে দেখিয়া চন্দনদাসের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল, সে মেয়েটি এক জন বয়স্কা সহচরীর সঙ্গে ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছিল। পূর্ণযৌবনা ষোড়শী—তাহার রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া হতাশ হইতে হয়। বৈষ্ণব রসসাহিত্য নিংড়াইয়া এই রূপের একটা কাঠামো খাড়া করা যাইতে পারে ; হয়তো এমনই কোনও গোরোচনা গোরী নবীনার নববিকশিত রূপ দেখিয়া প্রেমিক বৈষ্ণব কবি তাঁহার রাই কমলিনীকে গড়িয়াছিলেন, কে বলিতে পারে ? মেয়েটির প্রতি পদক্ষেপে দর্শকের হৃৎকমল দুলিয়া দুলিয়া উঠে, যেন হৃৎকমলের উপর পা ফেলিয়া সে চলিয়াছে।

তাহার মদির নয়নের অপাঙ্গদৃষ্টিতে মনের মধ্যে মধুর মাদকতা উন্মথিত হইয়া উঠে।

কিন্তু এত রূপ সত্ত্বেও মেয়েটির মুখখানি ম্লান, যেন তাহার উপর কালো মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। চোখ দুটি অবনত করিয়া ধীরপদে সে চলিয়াছে; তৈলসিক্ত চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো; পরণে আটপৌরে রাঙাপাড় শাড়ী। দেহে একখানিও গহনা নাই, এমন কি, নাকে বেসর, কানে দুল পর্যন্ত নাই। কেবল দুই হাতে দু'গাছি শঙ্খ।

মেয়েটির সঙ্গে যে সহচরী রহিয়াছে, তাহাকে সহচরী না বলিয়া প্রতিহারী বলিলেই ভালো হয়। সে যেন চারিদিক হইতে তাহাকে আগলাইয়া চলিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায়, বিগতযৌবনা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক। আঁট-সাট দোহারা গঠন, গোলাকৃতি মুখ, কলহপ্রিয় বড় বড় দুটা চোখ যেন সর্বদাই ঘুরিতেছে।

চন্দনদাস হাঁ করিয়া পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল, মেয়েটি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। পাশ দিয়া যাইবার সময় একবার চকিতের ন্যায় চোখ তুলিল, আবার তৎক্ষণাৎ মাথা হেঁট করিল। সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটা কটমট করিয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল, তাহার আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতার জন্য যেন কিছু বলিবে মনে করিল; কিন্তু চন্দনদাসের বিদেশীর মতো সাজ-সজ্জা দেখিয়া কিছু না বলিয়া সমস্ত দেহের একটা স্বৈরিণীসুলভ ভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনদাসও অমনি ফিরিল। তাহার নগর-ভ্রমণের কথা আর মনে ছিল না, সে একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকাইয়া রহিল। মেয়েটিও কয়েক পা গিয়া একবার ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিল। 'গেলি কামিনী, গজহু গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি'—চন্দনদাসের যেটুকু সর্বনাশ হইতে বাকি ছিল, তাহাও এবার হইয়া গেল।

সেও গঙ্গাঘাটের দিকে ফিরিল, অগ্রবর্তিনী স্নানার্থিনীদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইতে না দিয়া তাহাদের পিছু পিছু চলিল।

ক্রমে তাহারা ঘাটের সম্মুখে পৌঁছিল। এখানে চন্দনদাস আবার নিমাই পণ্ডিতকে দেখিতে পাইল। তিনি স্নান শেষ করিয়া বোধ হয় গৃহে ফিরিতেছিলেন; ভিজা গামছা গায়ে জড়ানো। চন্দনদাস লক্ষ্য করিল, মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই নিমাই পণ্ডিতের মুখে একটা ক্ষুব্ধ কারুণ্যের ভাব দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর স্ত্রীলোক দুইটি ঘাটে গিয়া স্নান করিল। চন্দনদাস একটু আড়ালে থাকিয়া চোরা চাহনিতে দেখিল। চন্দনদাস দুষ্মন্ত নয়,—"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা" তাহার মনে আসিল না; কিন্তু নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে তাহার ধারণা জন্মিল যে, মেয়েটি বেনের মেয়ে, তাহার স্বজাতি; কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, এত বয়স পর্যন্ত মেয়েটি অনূঢ়া কেন? বিধবা নয়, হাতের শঙ্খ ও রাঙাপাড় শাড়ী তাহার প্রমাণ। তবে ষোল-সতের বছরের মেয়ে বাংলাদেশে অবিবাহিত থাকে কি করিয়া?

কিন্তু সে যাহা হউক, স্নান সারিয়া তাহারা যখন ফিরিয়া চলিল, তখন সেও তাহাদের পিছু লইল।

চন্দনদাসের ব্যবহারটা বর্তমানকালে কিছু বর্বরোচিত বোধ হইতে পারে; কিন্তু এ কালের রুচি দিয়া সে কালের শিষ্টাচার বিচার করা সর্বথা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে শিষ্টাচারের সূক্ষ্ম অনুশাসন মানিয়া চলিবার মতো হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা চন্দনদাসের ছিল না। তাহার কাঁচা হৃদ্‌যন্ত্রটা একেবারেই অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া সেকালের ঠাকুর-দেবতারাও

কিরূপ বিহ্বল বে-এক্তিয়ার হইয়া পড়িতেন, তাহা তো ভক্ত কবিগণ লিপিবদ্ধ করিয়াই গিয়াছেন।—"এ ধনি কে কহ বটে!"

মোট কথা, চন্দনদাস তাহার মন-চোরা মেয়েটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এ-পথ হইতে ও-পথে কয়েকটা মোড় ফিরিয়া প্রায় একপোয়া পথ অতিক্রম করিবার পর মেয়েটি এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দনদাস দেখিল, পাড়াটা অপেক্ষাকৃত গরীব বেনে-পাড়া। অধিকাংশ বাড়ির খড়ের বা খোলার চাল।

গলির মধ্যে কিছুদূর গিয়া মেয়েটি এক ক্ষুদ্র পাকা বাড়ির দালানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বাড়িটা পাকা বটে, কিন্তু অতিশয় জীর্ণ ও শ্রীহীন। বাড়ির সম্মুখীন হইয়া চন্দনদাস দেখিল, দালানের উপর একটি ক্ষুদ্র বেনের দোকান। আদা, মরিচ, হলুদ, লঙ্কা, ছোট ছোট ধামিতে সাজানো আছে; একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বেসাতি করিতেছে। দালানের পশ্চাদ্ভাগে একটি দ্বার, উহাই অন্দরে প্রবেশ করিবার পথ। চন্দনদাস বুঝিল, ঐ পথেই মেয়েটি ও তাহার সঙ্গিনী অন্দরে প্রবেশ করিয়াছে।

চন্দনদাস বড় সমস্যায় পড়িল। সে কোন মতলব স্থির করিয়া ইহাদের অনুসরণ করে নাই, গুণের নৌকার ন্যায় অদৃশ্য রজ্জুবন্ধন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে; কিন্তু এখন সে কি করিবে? কেবলমাত্র মেয়েটির বাড়ি দেখিয়া ফিরিয়া যাইবে? চন্দনদাস বাড়ির সম্মুখ দিয়া কয়েকবার অলসভাবে যাতায়াত করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার মা তাহাকে নবদ্বীপ হইতে ভালো চুয়া কিনিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। সে কথা সে ভুলে নাই, আজ নগর-ভ্রমণের সময় কিনিয়া লইবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু চুয়া কিনিবার অছিলা এমন ভাবে সদ্ব্যবহার করিবার কথা এতক্ষণ তাহার মনেই আসে নাই।

সে দৃঢ়পদে দোকানের সম্মুখীন হইল ; মিঠা হাসিয়া বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগো ভালোমানুষের মেয়ে, তোমার দোকানে ভালো চুয়া আছে ?"

যে বৃদ্ধা বেসাতি করিতেছিল, তাহার দেহ-যষ্টিতে বিন্দুমাত্র রস না থাকিলেও প্রাণটা তাজা ও সরস ছিল। চন্দনদাসকে বাড়ির সম্মুখে অকারণ ঘুর্ঘুর্ করিতে দেখিয়া বুড়ী এই অনিশ্চিত ঘোরাঘুরির গূঢ় কারণটি ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করিতেছিল। পাড়ার কোনও চ্যাংড়া ছোঁড়া হইলে বুড়ী মুখ ছাড়িত ; কিন্তু এই কান্তিমান সুদর্শন ছেলেটির বিদেশীর মতো সাজ-পোষাক দেখিয়া সে একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল।

চন্দনদাসের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "আছে বৈ কি বাছা। এসো, ব'সো।"

চন্দনদাসও তাই চায়, সে দালানে উঠিয়া জলচৌকির উপর চাপিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তোমাদের বাড়িতে কি পুরুষমানুষ নেই ? তুমি নিজে বেসাতি করছ যে ?"

বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে কথা আর ব'লো না বাছা ; একটা ব্যাটাছেলে ঘরে থাকলে কি আজ আমাদের এমন খোয়ার হয় ?" তারপর কথা পাল্টাইয়া বলিল, "তা হ্যাঁ বাছা, তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি, নদের লোক নও বুঝি ?"

চন্দনদাস বলিল, "না, আমার বাড়ি অগ্রদ্বীপ।"

বুড়ী বলিল, "ও—তাই। কথায়-বার্তায় যেন বেনের ছেলে বলে মনে হচ্ছে।"

চন্দনদাস তখন জাতি-পরিচয় দিল, নিজের ও পিতার নাম উল্লেখ করিল। বুড়ী দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করিবার লোক পায় না, সে আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল, "ও মা, তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে গো—স্বজাত। আহা, যেমন সোনার কার্তিকের মতো চেহারা, তেমনি মার কোল জুড়ে বেঁচে থাকো।—কোথায় বিয়ে-থা করেছ ?"

চন্দনদাস কহিল, "তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আয়ি, এক বছর পরেই বৌ মরে যায়। তারপর আর বিয়ে করিনি।"

বুড়ী একটু বিমনা হইল ; তার পর উৎসুক ভাবে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

চন্দনদাস কথাপ্রসঙ্গে বলিল, "সমুদ্রে গিয়েছিলাম আয়ি, দু'বছর পরে দেশে ফিরছি। তা ভাবলাম, নদেয় একদিন থেকে যাই ; মার বরাত আছে চুয়া কেনবার, চুয়া কেনাও হবে, একটু জিরেন দেওয়াও হবে।"

বুড়ী বলিল, "তা বেশ করেছ বাবা, ভাগ্যিস্ এসেছিলে তাই তো অমন চাঁদমুখখানি দেখতে পেলাম—" বুড়ী একটা নিশ্বাস ফেলিল। তাহার প্রাণের ভিতরটা হায় হায় করিয়া উঠিল। আহা, যদি সম্ভব হইত !

চন্দনদাস এতক্ষণ ফাঁক খুঁজিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, তোমার আপনার জন কি কেউ নেই ?"

"একটি নাতনী আছে, আর সব মরে হেজে গেছে। পোড়াকপালী ছুঁড়ীর কপাল !" বলিয়া বুড়ী আঁচলে চোখ মুছিল।

"নাতনী !"—চন্দনদাস সচকিত হইয়া উঠিল ; তবে বুড়ীর নাতনীকেই সে দেখিয়াছে।—"তবে তুমি বুড়োমানুষ দোকান দেখ কেন ? সে দেখতে পারে না ?"

বুড়ী উদাস আশাহীন সুরে বলিল, "সে অনেক কথা, বাছা। আমাদের দুঃখের কাহিনী কাউকে বলবার নয়। সমাজ আমাদের বিনা দোষে জাতে ঠেলেছে, মুখ তুলে চাইবার কেউ নেই। আর কাকেই বা দোষ দেব, সব দোষ ঐ হতভাগীর কপালের। এমন রূপ নিয়ে জন্মেছিল, ঐ রূপই ওর শত্তুর।"

চন্দনদাসের কৌতূহল ও উত্তেজনা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কি ব্যাপার আয়ি? সব কথা খুলেই বলো না?"

বুড়ী কিন্তু রাজী হইল না, বলিল, "কি হবে বাবা আমাদের লজ্জার কথা শুনে? কিছু তো করতে পারবে না, কেবল মনে দুঃখ পাবে।"

"কে বললে, কিছু পারব না?"

"না বাবা, সে কেউ পারবে না।—আহা! সোনার প্রতিমা আমার কালই জলে ভাসিয়ে দিতে হবে রে!"—বলিয়া বুড়ী হঠাৎ মুখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চন্দনদাস বুড়ীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আয়ি, আমি বেনের ছেলে, তোর গা ছুঁয়ে বলছি, মানুষের যা সাধ্য আমি তা করব। তোর নাতনীর কি বিপদ বল্।"

বুড়ী উত্তর দিবার পূর্বেই, বোধ করি তাহার ক্রন্দনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সেই বিগতযৌবনা প্রহরিণী বাহির হইয়া আসিল, কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছিস্ কেন রে, বুড়ী? কি হয়েছে।"

বুড়ী বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী, তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, "কিছু নয় রে চাঁপা—অমনি। এই ছেলেটি দূর-সম্পর্কে আমার নাতি হয়, অনেক দিন পরে দেখলুম—তাই—"

চাঁপা চন্দনদাসের দিকে ফিরিল, বৃহৎ সুবর্তুল চক্ষু তাহার মুখের

উপর স্থাপন করিয়া বুড়ীর উদ্দেশে বলিল, "হুঁ—নাতি!—তোর নাতি আছে, আগে কখনও বলিস্ নি তো?"

বুড়ী কম্পিতস্বরে বলিল, "বললুম না, দূর-সম্পর্কে। আমার পিস্তুত বোনের—"

চাঁপা বলিল, "বুঝেছি"—তারপর চন্দনদাসকে প্রশ্ন করিল, "তোমাকে আজ পথে দেখেছি না?"

চন্দনদাস সটান মিথ্যা কথা বলিল, "কৈ, না! আমার তো মনে পড়ছে না!"

চাঁপা তীক্ষ্ণ-চক্ষে আরও কিছুক্ষণ চন্দনদাসকে নিরীক্ষণ করিল, শেষে মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল, "তবে আমারই ভুল। বুড়ী, তুই তা হ'লে তোর নাতির সঙ্গে কথা ক'—আমি একটু পাড়া বেড়িয়ে আসি। তোর নাতি আজ এখানে থাকবে তো? দেখিস্, ছেড়ে দিস্‌নি যেন, এমন রসের নাতি কালেভদ্রে পাওয়া যায়।"—বলিয়া চোখ ঘুরাইয়া বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল।

চাঁপা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেলে চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে?"

বুড়ীর তখনও হৃৎকম্প দূর হয় নাই, সে বলিল, "ও মাগী যমের দূত। বাবা, এমন ভয় হয়েছিল—এখনি টুঁটি টিপে ধরত। তুই যা দাদা, আর এখানে থাকিস্ নি। ওরে, তুই আমাদের কি ভালো করবি? ভগবান্ আমাদের ভুলে গেছেন। তুই এখান থেকে পালা, শেষে কি মায়ের নিধি বেঘোরে প্রাণ দিবি?"

চন্দনদাস বলিল, "সে কি ঠানদি, নাতিকে কি এমনি করেই তাড়াতে হয়? একটা পান পর্যন্ত দিতে নেই? তা ছাড়া চুয়া কিনতে এসেছি, চুয়া না দিয়েই তাড়িয়ে দিচ্ছিস্? তুই কেমন বেনের মেয়ে?"

বুড়ী এবার হাসিয়া ফেলিল। এই ছেলেটির মুখের কথা যতই সে শুনিতেছিল, ততই তাহার মন ভিজিতেছিল। তাহার প্রাণের একান্তে বিদলিত মুহ্যমান আশা একটু মাথা তুলিল। তবে কি এই শেষ সময়ে ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন ?

বুড়ী মনে ভাবিল,—যা হয় তা হয়, একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। কে বলিতে পারে, হয়তো অভাগিনীর ভাগ্যে চরম দুর্গতি বিধাতা লেখেন নাই ; নচেৎ নিরাশার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এই অপরিচিত বন্ধু কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ?

তখন বুড়ী সংকল্প স্থির করিয়া বলিল, "ও মা, সত্যি তো! চুয়ার কথা মনেই ছিল না। তা দেব দাদা—কিন্তু বড় দামী জিনিস, দাম দিতে পারবে তো ?"

"দাম কত ?"

"জীবন-যৌবন-মন-প্রাণ সব দিলেও সে জিনিসের দাম হয় না।"

চন্দনদাস একটু অবাক্ হইল, কিন্তু হারিবার পাত্র সে নয়, বলিল, "আচ্ছা, আগে জিনিস দেখি।"

"এই যে দেখাই। ওলো ও চুয়া, একবার এ দিকে আয় তো, দিদি।"

চন্দনদাস তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকিয়া উঠিল। তবে মেয়েটির নাম চুয়া! আর সে চুয়া কিনিতে এখানে আসিয়াছে। এ কি দৈব যোগাযোগ!

"কি বলছ ঠান্‌দি ?"—বলিতে বলিতে চুয়া অন্দরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাসকে দেখিয়া সে চমকিয়া বুকের উপর হাত রাখিল। চন্দনদাস সেই দিকেই তাকাইয়াছিল, দেখিল, চুয়ার কুমুদের মতো গাল দুটিতে কে যেন কাঁচা সিঁদূর ছড়াইয়া দিল। তার পর ম্রিয়মাণ লজ্জায় তাহার চোখ দুটি ধীরে ধীরে নত হইয়া পড়িল। চন্দনদাস

বুঝিল, চুয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে ; পথের ক্ষণিক-দেখা মুগ্ধ পান্থকে ভুলে নাই।

বুড়ী বলিল, "চুয়া, অতিথি এসেছে ; একটু মিষ্টিমুখ করা, পান দে।"

চুয়া মুখ তুলিল না, আস্তে আস্তে চন্দনদাসের সতৃষ্ণ চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। চন্দনদাস দ্বারের দিকেই তাকাইয়া রহিল। শেষে বুড়ী বলিল, "আমার চুয়াকে দেখলে ?"

"দেখলাম"—আগেও যে দেখিয়াছে, তাহা আর চন্দনদাস ভাঙিল না। বুড়ীও সে দিক্ দিয়া গেল না, বলিল, "কেমন মনে হ'ল ?"

"মনে হ'ল—" সহসা চন্দনদাস বুড়ীর দিকে ঝুঁকিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঠান্‌দি, চুয়ার কি বিপদ আমায় বলো। কেন তোমাদের সবাই জাতে ঠেলেছে ? ওর এখনও বিয়ে হয়নি কেন ?"

দ্বারের নিকট হইতে জবাব আসিল, "কি হবে তোমার শুনে ?"

এক হাতে ফুল-কাঁসার ছোট রেকাবির উপর চারিখানি বাতাসা ও দুটি পান, অন্য হাতে জলের ঘটি লইয়া চুয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। চন্দনদাসের শেষ কথাগুলি সে শুনিতে পাইয়াছিল ; শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। কেন এই অপরিচিত যুবকের এত কৌতূহল ? তাহাকে বলিয়াই বা লাভ কি ?—চুয়া রেকাবি ও ঘটি চন্দনদাসের সম্মুখে নামাইয়া আরক্ত-মুখে তীব্র অধীর স্বরে বলিল, "কে তুমি ? কোথা থেকে এসেছ ? কি হবে তোমার আমাদের কথা শুনে ?"

ক্ষণকালের জন্য চন্দনদাস বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া রহিল ; তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চুয়ার মুখের উপর চোখ রাখিয়া শান্ত সংযত স্বরে বলিল, "চুয়া, আমি তোমার স্বজাতি ; আমার বাড়ি অগ্রদ্বীপ। নবদ্বীপের ঘাটে

আমার ডিঙ্গা বাঁধা আছে। তোমার কি বিপদ, আমি জানি না, কিন্তু আমি যদি তোমায় সাহায্য করতে চাই, আমার সাহায্য কি নেবে না?"

চুয়ার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা সাদা হইয়া গেল। তাহার চোখে পরিত্রাণের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষণ-বিস্ফারিত আশার আলো ফুটিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তার পর সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন আমাকে মিছে আশা দিচ্ছ?"—বলিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

চন্দনদাস বসিয়া পড়িল। কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে একখানা বাতাসা তুলিয়া লইয়া মুখে দিল; তার পর আলগোছে ঘটির জল গলায় ঢালিয়া জলপান করিল। শেষে পান দুটি মুখে পুরিয়া বুড়ীর দিকে তাকাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "ঠান্‌দি, এবার তোমার গল্প বলো।"

"বলব, কিন্তু তুমি আগে একটা কথা দাও।"

"কি?"

"তুমি ওকে উদ্ধার করবে?"

"করব। অন্ততঃ প্রাণপণে চেষ্টা করব।"

"বেশ, উদ্ধার করা মানে ওকে এ দেশ থেকে নিয়ে পালাতে হবে। পারবে?"

"পারব—খুব পারব।"

"ভালো, কিন্তু তার পর?"

"তার পর কি?"

বুড়ী একটু দ্বিধা করিল; শেষে বলিল, "কিছু মনে ক'রো না, সব

কথা স্পষ্ট করে বলাই ভালো। তুমি জোয়ান ছেলে, চুয়াও যুবতী মেয়ে, তুমি ওকে চুরি করে নিয়ে যাবে। তার পর?"

চন্দনদাস জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

বুড়ী তখন স্পষ্ট করিয়া বলিল, "ওকে বিয়ে করতে পারবে?"

চন্দনদাসের চোখের সম্মুখে যেন একটা নূতন আলো জ্বলিয়া উঠিল; সে উদ্ভাসিত-মুখে বলিল, "পারব।"

"তোমার বাপ-মা—"

"তাঁরা আমার কথায় অমত করবেন না।"

বৃদ্ধা কম্পিত স্বরে বলিল, "বেঁচে থাকো দাদা, তুমি বড় ভালো ছেলে; কিন্তু ছুঁড়ীর যা কপাল—"

বুড়ী তখন চুয়ার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। চন্দনদাস করতলে কপোল রাখিয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে সে টের পাইল, চুয়া কখন চুপি চুপি আসিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছে।

চুয়ার বাপের নাম কাঞ্চনদাস। বেনেদের মধ্যে সে বেশ সংগতিপন্ন গৃহস্থ ছিল। চুয়ার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন কাঞ্চনদাস বাণিজ্যের জন্য নৌকা সাজাইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল। কাঞ্চনদাসের নৌকা গঙ্গার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল—আর ফিরিল না। সংবাদ আসিল, নৌকাডুবি হইয়া কাঞ্চনদাস মারা গিয়াছে।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে চুয়ার মাও মরিল। তখন বুড়ী ছাড়া চুয়াকে দেখিবার আর কেহ রহিল না। বুড়ী কাঞ্চনদাসের মাসী—আট বছর বয়স হইতে সে হাতে করিয়া চুয়াকে মানুষ করিয়াছে।

নৌকাডুবিতে কাঞ্চনদাসের সমস্ত সম্পত্তিই ভরা-ডুবি হইয়াছিল, কেবল এই ভদ্রাসনটি বাঁচিয়াছিল। বুড়ী দোকান করিয়া কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিল।

এই ভাবে বৎসরাধিক কাল কাটিল। চুয়ার বয়স যখন দশ বছর, তখন এক গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হইল।

এই সময় এক দিন জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া এই পথ দিয়া যাইতেছিল। চুয়াকে বাড়ির সম্মুখে খেলা করিতে দেখিয়া সে ঘোড়া হইতে নামিল। দুর্দান্ত জমিদারের মহাপাষণ্ড ভাইপো মাধবের নাম শুনিয়া দেশের লোক তো দূরের কথা, কাজি সাহেব পর্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপে। রাজার শাসন—সমাজের শাসন কিছুই সে মানে না। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়, স্বভাব তার চণ্ডালের মতো। সে দশ বছরের চুয়াকে চিবুক তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, তার পর বাড়িতে আসিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বুড়ী ভয়ে ভয়ে পরিচয় দিল। শুনিয়া মাধব বলিল, এ মেয়ের বিবাহ দেওয়া হইবে না, ইহাকে দৈবকার্যের জন্য মানত করিতে হইবে। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত মেয়ে কুমারী থাকিবে, তার পর মাধব আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে। তান্ত্রিক সাধনায় উত্তরসাধিকার স্থান অধিকার করিয়া কন্যার ষোল বছরের কৌমার্য সার্থক হইবে। সাধক—স্বয়ং মাধব।

এই হুকুম জারি করিয়া মাধব প্রস্থান করিল। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল; তান্ত্রিক সাধনার গূঢ় মর্মার্থ বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। বণিক্-সমাজ মাধবের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস করিল না, তাহারা চুয়াকে জাতিচ্যুত করিল। বিবাহও ভাঙিয়া গেল।

ক্রমে চুয়ার বয়স বাড়িতে লাগিল—বারো বছর বয়স হইল। বুড়ী দেশে কাহারও নিকট সাহায্য না পাইয়া শেষে চুয়াকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইবার মতলব করিল; কিন্তু বুড়ীর হাতে পয়সা কম, আত্মীয়বন্ধুরও একান্ত অভাব। তাহার মতলব সিদ্ধ হইল না; মাধবের কানে সংবাদ গেল।

মাধব আসিয়া বুড়ীকে পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা শাসন করিল ; তার পর চুয়াকে পাহারা দিবার জন্য চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। নাপিত-কন্যা চাঁপা চুয়ার অভিভাবিকাপদে অধিষ্ঠিত হইল। চাঁপা বয়সকালে তান্ত্রিক সাধন-ভজন করিয়াছিল, এখন যৌবনান্তে ধর্মকর্ম ত্যাগ করিয়াছে। সে চুয়া ও বুড়ীর উপর কড়া নজর রাখিতে লাগিল।

এইভাবে চারি বৎসর কাটিয়াছে। কয়েক দিন আগে মাধব আসিয়াছিল। সে চুয়াকে দেখিয়া গিয়াছে এবং বলিয়া গিয়াছে যে, আগামী অমাবস্যার রাত্রিতেই চুয়াকে দৈবকার্যে উৎসর্গ করিতে হইবে —সে জন্য যেন সে প্রস্তুত থাকে। অনুষ্ঠানের যাহাতে কোনও ত্রুটি না হয়, এ জন্য মাধব নিজেই সমস্ত বিধান দিয়া গিয়াছে। অমাবস্যার সন্ধ্যার সময় চুয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া স্নান করিবে ; স্নানান্তে রক্তবস্ত্র, জবামাল্য ও রক্তচন্দনের ফোঁটা পরিয়া ঘাট হইতে একেবারে সাধনস্থলে অর্থাৎ মাধবের উদ্যানবাটিকায় উপস্থিত হইবে। সঙ্গে ঢাক-ঢোল ইত্যাদি বাজিতে বাজিতে যাইবে। মাধব এইরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া যাইবার পর পাচ দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ কৃষ্ণাচতুর্দশী— কাল অমাবস্যা।

গল্প শেষ করিয়া বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দাদা, সব কথা তোমায় বললুম। এখন দেখ, যদি মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারো। তুমি ছাড়া ওর আর গতি নেই।"

গল্প শুনিতে শুনিতে চন্দনদাসের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল, ঐ দানব-প্রকৃতি লোকটার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও আক্রোশ অগ্নিশিখার মতো তাহার দেহকে দাহ করিতেছিল। সে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি যদি চুয়াকে বিয়ে করে কাল আমার নৌকোয় তুলে দেশে নিয়ে যাই—কে কি করতে পারে?"

দ্বারের আড়ালে চুয়ার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল; কিন্তু বুড়ী মাথা নাড়িয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তা হয় না দাদা। চাঁপা রাক্কুসী আছে—সে কখনই হ'তে দেবে না।"

চন্দনদাস বলিল, "চাঁপাকে সোনায় মুড়ে দেব। তাতে রাজি না হয়, মুখে কাপড় বেঁধে ঘরে বন্ধ করে রাখব।"

বুড়ী কাঁপিতে লাগিল, এতখানি দুঃসাহস তাহার পক্ষে কল্পনা করাও দুষ্কর, কিন্তু বুড়ীর প্রাণে আশা জাগিয়াছিল, আশা একবার জাগিলে সহজে মরিতে চায় না। তবু বুড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "সে যেন হ'ল, কিন্তু বিয়ে হবে কি করে? বিয়ে দেবে কে?"

"কেন—নদেয় কি পুরুত নেই?"

বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি মাধবকে জানো না। তার ভয়ে কোনও বামুন রাজি হবে না।"

চন্দনদাস আশ্চর্য হইয়া বলিল, "এখানকার বামুনরা এত ভীরু?"

"কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে দাদা, যে জমিদারের ভাইপোর শত্রুতা করবে? তবে—শুনেছি, জগন্নাথ ঠাকুরের ছেলে নিমাই পণ্ডিত বড় ডাকাবুকো ছেলে, কাউকে ভয় করেন না। বয়স কম কিনা!—কিন্তু তিনি কি রাজি হবেন?"

চন্দনদাস মহা উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ, ঠান্‌দি—নিমাই পণ্ডিতই উপযুক্ত লোক। তাঁকে আমি আজ গঙ্গাঘাটে দেখেছি; ঠিক দেবতার মতো চেহারা—তিনি নিশ্চয় রাজি হবেন।—ঠান্‌দি, আমি এখন তাঁর খোঁজে চললাম, ওবেলা সব ঠিক করে আবার আসব। তখন—"

"কিন্তু তিনি যদি রাজি না হন?"

চন্দনদাস চিন্তা করিল, "যদি রাজি না হন—তিনি রাজি হোন

বা না হোন, রাত্রিতে কোনও সময় আমি আসবই।—নাই বা হ'ল বিয়ে? আজ রাত্রিতে চুয়াকে চুরি করে নিয়ে যাব। তারপর দেশে গিয়ে বিয়ে করব—কি বলো?"

বুড়ীর মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। চন্দনদাসের যে কোনও দুরভিসন্ধি নাই, তাহা সে অন্তরে বুঝিতেছিল; কিন্তু তবু—চন্দনদাস একেবারে অপরিচিত। সেও যে একজন ধূর্ত প্রবঞ্চক নয়, তাহা বুড়ী কি করিয়া জানিবে? বারবার দাগা পাইয়া বুড়ীর মন বড় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

এই সময় চুয়া দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। সংশয় সংকোচ করিবার তাহার আর সময় ছিল না। এক দিকে অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ, অন্য দিকে সম্ভাবনা। চুয়া সজল চক্ষু চন্দনদাসের মুখের উপর রাখিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "তুমি আজ রাত্তিরে এসো। নিমাই পণ্ডিত যদি রাজি না হন, তবু, তোমার ধর্মের ওপর বিশ্বাস করে আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

চন্দনদাসের বুক নাচিয়া উঠিল। সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে কি বলিতে যাইতেছিল—এমন সময় বাধা পড়িল।

গলির মধ্যে দ্রুত অশ্বখুর-ধ্বনি শুনা গেল। চুয়া একটা আর্ত চিৎকার গলার মধ্যে রোধ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বুড়ী থরথর করিয়া কাঁপিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

পরক্ষণেই এক জন অশ্বারূঢ় ব্যক্তি বাড়ির সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া থামাইল। লোকটার গায়ে লালরঙের কোর্তা, কোমরে তরবারি, মাথায়

পাগ নাই, ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে ; কপালে প্রকাণ্ড একটা সিন্দুরের ফোঁটা। ফোঁটার নিচে বিশাল ভাঁটার মতো চোখ দুটাও প্রায় অনুরূপ রক্তবর্ণ। মুখে ঘনকৃষ্ণ গোঁফ এবং গালে গালপাট্টা। বয়স বোধ করি পঁয়তাল্লিশ।

এই ভীষণাকৃতি লোকটার মুখের প্রতি অবয়বে যেন জীবনব্যাপী দুষ্কৃতি ও পাপ পঙ্কিল রেখায় অঙ্কিত হইয়া আছে। এমন দুষ্কার্য নাই—যাহা সে করে নাই ; এমন মহাপাতক নাই—যাহা সে করিতে পারে না। একটা ঘৃণার শিহরণ চন্দনদাসের দেহের উপর দিয়া বহিয়া গেল ; সে চিনিল, ইনিই জমিদারের দুর্দান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব।

মাধব একলাফে ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া দালানের উপর উঠিল। সম্মুখেই চন্দনদাস ; রক্তচক্ষু দ্বারা আপাদ-মস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বভাবকর্কশ ভয়ংকর স্বরে মাধব প্রশ্ন করিল, "তুই কে ?"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, মাধবের দম্ভস্ফীত পৈশাচিক মুখে একটা লাথি মারে ; কিন্তু সে তাহা করিল না। তাহার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো চিন্তাকার্য চলিতেছিল। মাধবের অভাবনীয় আবির্ভাবে তাহার সমস্ত মতলব পণ্ড হইয়া গিয়াছিল ; সে ভাবিতেছিল, এ অবস্থায় কি করিলে সব দিক্ রক্ষা হয় ? মাধবের সঙ্গে একটা গণ্ডগোল বাধাইলে লাভ হইবে না, বরং বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। উপস্থিত ক্ষেত্রে কোনও হাঙ্গামা না করিয়া অপসৃত হওয়াই সুবিবেচনার কাজ। অথচ এই পাষণ্ডটার মুখ দেখিলে ও কথা শুনিলে মেজাজ ঠিক রাখা দুষ্কর। চুয়ার সর্বনাশ করিবার জন্যই এই নরপশু তাহাকে ছয় বৎসর জিয়াইয়া রাখিয়াছে, ভাবিতে চন্দনদাসের চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত রক্তাভ হইয়া উঠিল।

তবু সে যথাসাধ্য আত্মদমন করিয়া মাধবের কথার উত্তর দিল, বলিল, "সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?"

মাধব একটা অকথ্য গালি দিয়া বলিল, "তুই এখানে কি চাস্?"

চন্দনদাস আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিল না, তাহার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সে প্রত্যুত্তরে মাধবের নাসিকায় বজ্রসম কিল বসাইয়া দিয়া বলিল, "এই চাই।"

এই নিরীহ-দর্শন যুবকের নিকট হইতে মাধব এত বড় দুঃসাহসিক কার্য একেবারে প্রত্যাশা করে নাই, সে সরিষার ফুল দেখিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

চন্দনদাস দেখিল, আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়; সে নিরস্ত্র, মাধবের কোমরে তরবারি রহিয়াছে। ঘোড়াটা সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল, সে দালান হইতে লাফ দিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। এই সময় মাধব ষণ্ডের মতো গর্জন করিয়া কোমর হইতে তরবারি বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তাহার নাগালে পৌঁছিবার পূর্বেই চন্দনদাস তেজী ঘোড়ার পেট দুই পায়ে চাপিয়া ধরিয়া সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

কেহ কেহ লুকাইয়া পাপাচরণ করে; কিন্তু ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পাশবিক বলে প্রকাশ্যভাবে পাপানুষ্ঠান করিতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদের অপরাধ-ক্লান্ত জীবনে এমন অবস্থা আসে, যখন কেবল মাত্র রমণীর সর্বনাশ করিয়া আর তাহারা তৃপ্তি পায় না। তখন তাহারা পাপাচারের সহিত ধর্মের ভণ্ডামি মিশাইয়া তাহাদের দুষ্কার্যের মধ্যে এক প্রকার নূতন রস ও বিলাসিতা সঞ্চারের চেষ্টা করে। মাধব এই শ্রেণীর পাপী।

চন্দনদাস তাহারই ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিবার পর মাধব নিষ্ফল আক্রোশে আর কাহাকেও সম্মুখে না পাইয়া

বুড়ীকে ধরিল ; বুড়ীর চুলের মুঠি ধরিয়া তলোয়ার দিয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু কাটিতে গিয়া তাহার মনে হইল, বুড়ীকে মারিলে হয়তো সেই ধৃষ্ট যুবকের পরিচয় অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে। কিল খাইয়া কিল চুরি করিবার লোক মাধব নয় ; তখনও তাহার নাকের রক্তে গোঁফ ভাসিয়া যাইতেছিল। সে বুড়ীর চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া চলিল।

আঙ্গিনার মাঝখানে বুড়ীকে আছড়াইয়া ফেলিয়া তাহার শীর্ণ হাতে একটা মোচড় দিয়া মাধব বলিল, "হারামজাদি বুড়ী, ও ছোঁড়া তোর কে বল্।"

পূর্বেই বলিয়াছি, বুড়ী বুদ্ধিমতী ; তাই ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেলেও তাহার চিন্তা করিবার শক্তি ছিল। সে বুঝিয়াছিল, কোনও কথা না বলিলেও প্রাণ যাইবে এবং ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিলেও প্রাণ যাইবে ; সুতারং মধ্যপথ অবলম্বন করাই যুক্তি। সর্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত-গণ অর্ধেক ত্যাগ করেন, বুড়ীও তেমনই ষড়যন্ত্রের অংশটা বাদ দিয়া আর সব সত্য কথা বলিবে স্থির করিল। তাহাতে আর কিছু না হউক, মাধবের হাতে প্রাণটা বাঁচিয়া যাইতে পারে।

বুড়ী তখন অকপটে চন্দনদাসের যতটা পরিচয় জানিতে পারিয়াছিল, তাহা মাধবের গোচর করিল। চাঁপা পাছে অনর্থক হাঙ্গামা করে, এই ভয়ে মিছামিছি চন্দনদাসকে নাতি বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে,অনেক মাথার দিব্য, চোখের দিব্য দিয়া বলিল যে, চন্দনদাসকে সে পূর্বে কখনও দেখে নাই,আজ প্রথম সে তাহার দোকানে আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করে। তাহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল কি না, তাহাও বুড়ীর অজ্ঞাত।

চাঁপা মাধবের বাড়িতে খবর দিতে গিয়াছিল, এতক্ষণে এক ঝাঁক পাইক সঙ্গে লইয়া পদব্রজে ফিরিল। পাইকদের হাতে সড়কি, ঢাল; জাতিতে তেঁতুলে বাগ্‌দী। ইহাদেরই বাহুবলে মাধব দেশটাকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রভু ও ভৃত্যে অবস্থাভেদ ছাড়া প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না।

বুড়ীকে নানা প্রশ্ন করিয়া শেষে বোধ হয় মাধব তাহার গল্প বিশ্বাস করিল। চাঁপা যাহা বলিল, তাহাতে বুড়ীর কথা সমর্থিত হইল। তা ছাড়া মাধবের রক্তচক্ষুর সম্মুখে বুড়ী মিথ্যা কথা বলিবে, ইহাও দাম্ভিক মাধব বিশ্বাস করিতে পারে না। সে এদিক্‌ ওদিক্‌ তাকাইয়া বলিল, "তোর নাতনী কোথায়?"

বুড়ী বলিল, "ঘরেই আছে, বাবা।"

মাধব চাঁপাকে হুকুম করিল, "দেখে আয়।"

চাঁপা দেখিয়া আসিয়া বলিল, "চুয়া ঘরেই আছে বটে।"

মাধবের তখন বিশ্বাস জন্মিল, চুয়া সম্বন্ধে ভয়ের কোনও কারণ নাই। তবু সে দুইজন পাইককে বুড়ীর বাড়ি পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত করিল, বলিল, "কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত এ বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দিবিনে। যদি কেউ ঢুকতে চায়, তার গলায় সড়্‌কি দিবি।"

এইরূপে বাড়ির সুব্যবস্থা করিয়া মাধব বাহিরে আসিল। এই সময় একবার তাহার মনে হইল, আর বৃথা দেরি না করিয়া আজই চুয়াকে নিজের প্রমোদ-উদ্যানে টানিয়া লইয়া যায়; কিন্তু তাহা হইলে এত বৎসর ধরিয়া যে চরম বিলাসিতার আয়োজন করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মাধব নিরস্ত হইল। তৎপরিবর্তে যে স্পর্ধিত বেনের ছেলেটা তাহার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করিয়াছে, তাহার নৌকা লুঠ করিয়া তাহাকে নিজের চক্ষুর সম্মুখে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া কুকুর দিয়া

খাওয়াইবার আয়োজনে দিনটা সদ্ব্যয় করিতে মনস্থ করিল। এটাও একটা মন্দ বিলাসিতা নয়।

বাহিরে আসিয়া মাধব তাহার সর্দার-পাইককে বলিল, "বদন, তুই দশ জন পাইক নিয়ে গঙ্গাঘাটে যা। সেখানে চন্দনদাস বেনের নৌকো আটক কর্। আমি যাচ্ছি।" বলিয়া আর এক জন পাইককে ঘোড়া আনিতে পাঠাইল।

বদন সর্দার প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া যখন ঘাটে পৌঁছিল, তখন চন্দনদাসের নৌকা দুখানি ভাগীরথীর বক্ষে শুভ্র পাল উড়াইয়া উজান বাহিয়া চলিয়াছে; বহুপদবিশিষ্ট বিরাট জল-পতঙ্গের মতো তাহাদের দাঁড়গুলি যেন গঙ্গার উপর তালে তালে পা ফেলিতেছে।

ওদিকে চন্দনদাস তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, পথে লোকজন কম। চন্দনদাস ধাবমান ঘোড়ার পিঠে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল—এখন কর্তব্য কি? প্রথমতঃ, চুয়াকে রক্ষা করিতে হইবে। মাধবের নাকে কিল মারার ফলে তাহার ক্রোধ কোন্ পথ লইবে, অনুমান করা কঠিন; মাধব চুয়ার কথা ভুলিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইতে পারে; তাহাতে চুয়া কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, তাহার নৌকা বাঁচাইতে হইবে। ক্রোধান্ধ মাধব প্রথমে তাহাকেই ধরিতে আসিবে; তখন তাহার অমূল্য পণ্য ও সোনাদানায় বোঝাই নৌকা লুণ্ঠিত হইবে। মাধব রেয়াৎ করিবে না।

ঘাটে পৌঁছিবার পূর্বেই চন্দনদাস কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। অশ্বত্থ-শাখায় ঘোড়া বাঁধিয়া সে দ্রুতপদে নৌকায় গিয়া উঠিল; দেখিল,

মাঝি-মাল্লারা আহার করিতে বসিয়াছে। চন্দনদাস সর্দার-মাঝিকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, "এখনি নৌকো খুলতে হবে।"

হতবুদ্ধি মাঝি বলিল, "এখনি? কিন্তু—"

"শোনো, তর্ক করবার সময় নেই। এই দণ্ডে নৌকো খোলো—পাল আর দাঁড় দুই লাগাও। আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত যতদূর সম্ভব উজান বেয়ে যাবে, তারপর গাঙের মাঝখানে নোঙর ফেলবে। আমি যতদিন না ফিরি সেইখানে অপেক্ষা করবে। বুঝলে?"

"আপনি সঙ্গে যাবেন না?"

"না। এখন যাও, আর দেরি ক'রো না। যতদিন আমি না ফিরি সাবধানে নৌকো পাহারা দিও।"

"যে আজ্ঞা"—বলিয়া প্রাচীন মাঝি চলিয়া গেল। মুহূর্ত পরে দুই নৌকার মাঝি-মাল্লার হাঁকডাক ও পাল তোলার হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। এই অবকাশে চন্দনদাস নৌকার পশ্চাতে মাণিকভাণ্ডারে গিয়া কিছু জিনিস সংগ্রহ করিয়া লইল। প্রথমে সিন্দুক হইতে মোহর-ভরা একটা সর্পাকৃতি লম্বা থলি বাহির করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল। যে-কার্যে যাইতেছে, তাহাতে কত অর্থের প্রয়োজন কিছুই স্থিরতা নাই; অথচ বোঝা বাড়াইলে চলিবে না। চন্দনদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া একছড়া মহামূল্য সিংহলী মুক্তার হার গলায় পরিয়া লইল। যদি মোহরে না কুলায়, হার বিক্রয় করিলে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাইবে।

এ ছাড়া আরও দুইটি জিনিস চন্দনদাস সঙ্গে লইল। একটি ইস্পাতের উপর সোনার কাজ করা ছোট ছোরা; এটি সে কোচিনে এক আরব বণিকের নিকট কিনিয়াছিল। দ্বিতীয়,—এক কাফ্রির উপহার একটি লোহার কাঁটা। কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ লোহার কাঁটা, সেকালে সৌখীন স্ত্রী-পুরুষ এইরূপ কাঁটা চুলে পরিত। এই কাঁটার বিশেষত্ব এই যে, ইহার

তীক্ষ্ম অগ্রভাগ শরীরের কোনও অংশে ফুটিলে তিনবার নিশ্বাস ফেলিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হইবে। চন্দনদাস কাঁটার সূক্ষ্মাগ্র সোনার খাপে ঢাকিয়া সাবধানে নিজের চুলের মধ্যে গুঁজিয়া লইল।

নৌকা হইতে নামিয়া চন্দনদাস নগরের ভিতর দিয়া আবার হাঁটিয়া চলিল। ঝাঁ-ঝাঁ দ্বিপ্রহর,আশে-পাশে দোকানের মধ্যে দোকানি নিদ্রালু; মধ্যাকাশ হইতে সূর্যদেব প্রখর রৌদ্র ঢালিয়া দিতেছেন। গাছপালা পর্যন্ত নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে; মানুষ গৃহতলের ছায়ার আশ্রয় লইয়াছে।

কিছুদূর যাইবার পর একটা মোড়ের মাথায় পৌঁছিয়া চন্দনদাস এবার কোন্ পথে যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার চোখে পড়িল, একটা নয়-দশ বছরের কটিবাস-পরিহিত শীর্ণকায় বালক প্রচণ্ড মার্তণ্ড-ময়ূখ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া পথের মধ্যে একাকী ডাণ্ডাগুলি খেলিতেছে। চন্দনদাস হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল। বালক ক্রীড়ায় বিরাম না দিয়া, যষ্টির আঘাতে ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডটিকে চন্দনদাসের দিকে তাড়িত করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর প্রবীণের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দনদাসের বেশভূষা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "সওদাগর! সমুদ্দুর থেকে আসছ—হ্যাঃ?"

বালকের ভাষা ও বাক্‌প্রণালী অতি অদ্ভুত—আমরা তাহা সরল ও সহজবোধ্য করিয়া দিলাম।

চন্দনদাস বলিল, "হ্যাঁ। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি কোথায় জানিস্?

বালক বলিল,—"হিঃ—জানি।"

"আমাকে সেখানে নিয়ে চল্।"

বালকের ধূর্ত মুখে একটু হাসি দেখা দিল, সে এক চক্ষু মুদিত করিয়া বলিল, "ডাংগুলি খেলছি যে।"

"পয়সা দেব।"

আকর্ণ দন্তবিকাশ করিয়া বালক হাত পাতিল, "আগে দাও!"

চন্দনদাস তাহাকে একটা কপর্দ্দক দিল, তখন সে আবার ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

বেশি দূর যাইতে হইল না; নিম্ববৃক্ষচিহ্নিত একটা বাড়ি যষ্টি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিয়া বালক প্রস্থান করিতেছিল, চন্দনদাস তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল, বলিল, "তুই যদি আর একটা কাজ কর্‌তে পারিস্, তোকে চারটে পয়সা দেব।"

"কি?"

"কাঞ্চন বেনের বাড়ি জানিস্?"

বালকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, "চুয়া? মাধায়ের কই মাছ? জানি।—হি হি!"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, অকালপক্ক ছোঁড়ার গালে একটা চপেটাঘাত করে; কিন্তু সে কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, চুয়া। শোন্, তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাবি, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবি না, কেবল দেখে আসবি, সেখানে কি হচ্ছে। পারবি?"

বালক বলিল, "হিঃ—পয়সা দাও।"

চন্দনদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আগে খবর নিয়ে আসবি, তবে পয়সা পাবি। আমি এইখানেই থাকব।"

বালক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে গবেষণা করিল, চন্দনদাসকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না? শেষে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া পূর্ব্ববৎ ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে প্রস্থান করিল।

চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই টোলের আটচালা; ছাত্ররা কেহ নাই, নিমাই পণ্ডিত একাকী বসিয়া

আছেন। তাঁহার কোলে তুলটের একখানি নূতন পুঁথি ; পাশে লেখনী ও মসীপাত্র। চন্দনদাসের পদশব্দে নিমাই পণ্ডিত মুখ তুলিলেন ; প্রশান্ত বিশাল চক্ষু হইতে শাস্ত্র-চিন্তাজনিত স্বপ্নাচ্ছন্নতা দূর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে চান্ ?"

চন্দনদাস বলিল, "নিমাই পণ্ডিতকে।"

"আমিই নিমাই পণ্ডিত।"

পাদুকা খুলিয়া চন্দনদাস গিয়া নিমাই পণ্ডিতকে প্রণাম করিল। নিমাই পণ্ডিত বয়সে তাহার অপেক্ষা ছোট হইলেও ব্রাহ্মণ। তুলসী পাতার ছোট বড় নাই।

নিমাই পণ্ডিত প্রণাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—আপনিই কি আজ দুখানি নৌকা নিয়ে সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরছেন ?"

চন্দনদাস বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আমিই।

নিমাই পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "আজ আপনার নৌকার ঢেউয়ে নবদ্বীপের একটি অমূল্য রত্ন ভেসে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে রক্ষা করা গিয়েছে। যা হোক্, আপনি—?"

চন্দনদাস নিজের পরিচয় দিয়া শেষে করযোড়ে বলিল, আপনি ব্রাহ্মণ এবং মহাপণ্ডিত, আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করলে আমার অপরাধ হয়।"

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "বেশ, কি ব্যাপার বলো তো ?"

চন্দনদাস বলিল, "একটা কাজে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। নবদ্বীপে কাউকে আমি চিনি না, কেবল আপনার নাম শুনেছি। শুনেছি, আপনি শুধু অপরাজেয় পণ্ডিত নন, সৎকার্য করবার সাহসও আপনার অদ্বিতীয়। আমাকে সাহায্য করবেন কি ?"

নিমাই পণ্ডিত বুঝিলেন, বণিকতনয় আজ গুরুতর কোনও কাজ আদায় করিতে আসিয়াছে, মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তোমার নম্রতা আর বিনয় দেখে ভয় হচ্ছে। যা হোক্‌, প্রস্তাবটা কি শুনি ?"

চন্দনদাসও হাসিল ; বুঝিল, নিমাই পণ্ডিতকে মিষ্ট চাটুকথায় বিগলিত করা চলিবে না, তাঁহার সহিত অকপট ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনি কাঞ্চন বেনের মেয়ে চুয়াকে জানেন ?"

নিমাই পণ্ডিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল, বলিলেন, "জানি। চুয়ার কথা নবদ্বীপে সকলেই জানে।"

চন্দনদাস বলিয়া উঠিল, "তবু তাকে উদ্ধারের চেষ্টা কেউ করে না ?"

নিমাই পণ্ডিত স্থির হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

চন্দনদাস তখন বলিল, "আমি চুয়াকে বিয়ে করতে চাই। আপনি সহায় হবেন কি ?"

নিমাই পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কোল হইতে পুঁথি নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু চুয়া সম্বন্ধে সব কথা তুমি জানো কি ?"

"যা জানি, আপনাকে বলছি"—এই বলিয়া আজ নৌকা হইতে নামিবার পর এ পর্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিল ; শেষে কহিল, এই নির্বান্ধব পুরীতে চুয়া যেমন একা, আমিও তেমনি একা। এখন আপনি যদি সাহায্য করেন, তবেই কিছু করতে পারি। নচেৎ একটি বালিকার সর্বনাশ হয়।"

নিমাই পণ্ডিত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

এই সময় সেই বালক ডাংগুলি হস্তে ফিরিয়া আসিল। চন্দনদাস

ছুতার একটু বাড়াইয়া বলিল, "তিন তঙ্কা।"

চন্দনদাস নিঃশব্দে তাহার হাতে এক মোহর দিল। ছুতার স্বপ্নেও এত মূল্য কল্পনা করে নাই, সে কিছুক্ষণ হতবাক্ থাকিয়া মহানন্দে ডিঙ্গির মালিকত্ব চন্দনদাসকে সমর্পণ করিল।

ডিঙ্গি তৎক্ষণাৎ গঙ্গার জলে ভাসানো হইল। নিমাই পণ্ডিত ও চন্দনদাস তাহাতে আরোহণ করিয়া দুই জোড়া দাঁড় হাতে লইলেন। দাঁড়ের আঘাতে ডিঙ্গি জ্যা-মুক্ত তীরের মতো জলের উপর ছুটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ গঙ্গাবক্ষে দাঁড় টানিয়া উভয়ে দেখিলেন, ডিঙ্গি নির্দোষ ও অতি সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। দুই জনে সন্তুষ্ট হইয়া তীরে ফিরিলেন। তার পর নৌকা ছুতারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "কাল বৈকালে আমি এসে ডিঙ্গি নিয়ে যাব।"

ছুতার আহ্লাদে এক দিনের জন্য নৌকা রাখিতে সম্মত হইল।

অতঃপর নিমাই পণ্ডিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চন্দনদাসের তখনও কাজ শেষ হয় নাই, সে গঙ্গার ধার দিয়া ঘাটের দিকে চলিল।

যে ঘাটে দ্বিপ্রহরে নৌকা বাঁধিয়াছিল, সেই ঘাটে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। ঘাটে কয়েকটি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁধা ছিল; চন্দনদাস কয়েকজন মাঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু, তোমরা জেলে তো?"

"আজ্ঞে, কর্তা।"

"তোমাদের মোড়ল কে?"

একজন বৃদ্ধ গোছের জেলে বলিল, "আজ্ঞে কর্তা, আমি মোড়ল। আমার নাম শিবদাস।"

"বেশ। তোমার সঙ্গে আমি কিছু কারবার করতে চাই। এখানে যত জেলে আছে, সবাই তোমার অধীন তো?"

"আজ্ঞে।"

"কত জেলে-ডিঙ্গি তোমাদের আছে ?"

"তা—ত্রিশ-চল্লিশখানা হবে।"

"বেশ। শোনো ; তোমাদের যত জেলে-ডিঙ্গি আছে, সব আমি ভাড়া করলাম। তোমরা জেলে-মাঝির দল কাল বেলা তিন পহরের সময় বেরুবে ; বেরিয়ে সটান স্রোতের মুখে দক্ষিণে গিয়ে শান্তিপুরের ঘাটে নৌকো বাঁধবে। তারপর সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত আমি যদি না যাই, তাহ'লে আবার ফিরে আসবে। —বুঝলে ?"

"বুঝলাম কর্তা ; কিন্তু কাজটা কি, তা তো এখনও জানতে পারিনি।"

"কাজের কথা শান্তিপুরের ঘাটে জানতে পারবে। কেমন, রাজি আছ ?"

"আজ্ঞে, গররাজি নই ; কিন্তু ধরুন, শান্তিপুরের ঘাটে যদি আপনার দেখা না পাই ?"

"বলেছি তো, তাহ'লে ফিরে আস্‌বে।"

"কিন্তু আমাদের যাওয়া-আসা যে তাহ'লে না-হক হয়রানি হয়, কর্তা। আপনাকে তখন পাব কোথায় ? আপনাকে তো চিনি না।"

চন্দনদাস হাসিয়া বলিল, "তা হ'লেও তোমাদের লোকসান হবে না। তোমাদের অর্দ্ধেক ভাড়া আমি আগাম দিয়ে যাব। সব নৌকো শান্তিপুরে যাওয়া-আসার জন্যে কত ভাড়া লাগবে ?"

শিবদাস মোড়ল বিবেচনা ক'রিয়া বলিল, "আজ্ঞে, দশটি তঙ্কার কমে হবে না।"

চন্দনদাস একটু ব্যবসাদারি করিল। কারণ, এক কথায় রাজি হইয়া গেলে জেলেরা কিছু সন্দেহ করিতে পারে। কিছুক্ষণ কসামাজার

পর নয় তঙ্কা ভাড়া ধার্য হইল। চন্দনদাস পাঁচ তঙ্কা শিবদাস মোড়লের হাতে দিয়া বলিল,—"এই নাও; কিন্তু কথার নড়চড় যেন না হয়।"

"আজ্ঞে"—শিবদাস মুদ্রা গণিয়া লইল, "আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন কর্তা, ঠিক সময়ে আমরা শান্তিপুরের ঘাটে হাজির থাকব—"

"সব ডিঙ্গি নিয়ে যাবে, একখানাও বাদ না পড়ে।"

"আজ্ঞে, একখানাও বাদ পড়বে না।"

এইরূপে নবদ্বীপ হইতে সমস্ত ডিঙ্গি তফাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া চন্দনদাস কতকটা নিশ্চিন্তমনে নিমাই পণ্ডিতের গৃহে ফিরিল। সেইখানেই তাহার রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

রাত্রি তিন প্রহরে, চুয়ার বাড়ির দালানে পাইক দুই জন বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একজন দেয়ালে ঠেস দিয়া পদযুগল প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে কখন্ কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল; তাহার নাসারন্ধ্র হইতে কামারের হাপরের মতো এক প্রকার শব্দ নির্গত হইতেছিল।

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার; কিন্তু অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে কিছু কিছু দেখা যায়। চন্দনদাস নিঃশব্দে ছায়ার মতো দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাঁ হাতে সেই ক্ষুদ্র ছোরা। কিয়ৎকাল মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া সে পাইকের নাসিকাধ্বনি শুনিল, তারপর দালানের গাঢ়তর অন্ধকারের ভিতর তাহার চক্ষু বস্তু নির্বাচন করিতে আরম্ভ করিল।

যে পাইকটা বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার পদদ্বয় ঠিক দরজার সম্মুখে প্রসারিত; ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া

যাইতে হইবে। তা ছাড়া দরজার কবাট ভেজানো রহিয়াছে, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ কি না, বুঝা যাইতেছে না। চন্দনদাস ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে হাত বাড়াইয়া কবাট একটু ঠেলিল। মরিচা-ধরা হাঁসকলে ছুঁচার ডাকের মতো শব্দ হইল। দরজা ঈষৎ খুলিল।

হাঁসকলের শব্দে পাইকের হাপর হঠাৎ বন্ধ হইল। চন্দনদাস স্পন্দিত-বক্ষে ছোরা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু পাইক জাগিল না, আবার তাহার নাক ডাকিয়া উঠিল।

চন্দনদাস তখন আবার কবাট একটু ঠেলিল, কবাট খুলিয়া গেল। এবারও একটু শব্দ হইল বটে, কিন্তু কেহ জাগিল না। তখন চন্দনদাস ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে পাইকের পদযুগল লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া চন্দনদাস চারিদিকে চাহিল। সম্মুখে কয়েকটা ঘর অস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে; কিন্তু কোন্ ঘরে চুয়া ঘুমাইতেছে? চাঁপাও বাড়িতে আছে; চুয়াকে খুঁজিতে গিয়া যদি চাঁপা জাগিয়া উঠে, তবেই সর্বনাশ। চন্দনদাস কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার হাতে মৃদু স্পর্শ হইল।

চন্দনদাস চমকিয়া উঠিয়া অজ্ঞাতসারেই ছোরা তুলিল। এই সময় তাহার কানের কাছে মৃদু শব্দ হইল, "এসেছ?"

"চুয়া!" কোমরে ছোরা রাখিয়া চন্দনদাস দুই হাতে চুয়ার হাত ধরিল, বলিল, "চুয়া! এসেছি।"

চুয়ার নিশ্বাসের মতো মৃদু চাপা স্বর থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল; সে বলিল, "তুমি আসবে বলেছিলে, তাই আমি তোমার জন্যে সারারাত জেগে আছি।"

অন্য সময় কথাগুলি অভিসারিকার প্রণয়বাণীর মতো শুনাইত; কিন্তু

বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও চন্দনদাসের মনে হইল, এত মধুর শব্দসমষ্টি সে আর কখনও শুনে নাই। চুয়ার মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। অথচ অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। চন্দনদাস চুয়ার কানে কানে বলিল, "চুয়া, একটা আলো জ্বালতে পারো না? তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

দু'জনে অন্ধকারে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, চুয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, এসো"—বলিয়া হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। চন্দনদাস তেমনই মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "চাঁপা কোথায়?"

"ঘুমুচ্ছে।"

"ঠান্‌দি?"

"ঠান্‌দিও ঘুমিয়ে পড়েছে।"

গোহালের মতো একটা পরিত্যক্ত ঘরে লইয়া গিয়া চুয়া চকমকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিল। তখন প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে চুয়ার মুখ দেখিয়া চন্দনদাস চমকিয়া উঠিল—চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে; আশা, আশঙ্কা ও তীব্রোৎকণ্ঠার দ্বন্দ্বে চুয়ার অনুপম রূপ যেন ছিঁড়িয়া ভাঙিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

চন্দনদাসের বুকে বেদনার শূল বিঁধিল, সে বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "চুয়া!"

চুয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; রোদনরুদ্ধ স্বরে বলিল, "তোমার নৌকো চলে গেছে শুনে এত ভয় হয়েছিল—"

চন্দনদাস চুয়ার পাশে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "চুয়া, আর ভয় নেই। তোমার উদ্ধারের সমস্ত ব্যবস্থা করেছি।"

চুয়া চোখ মুছিয়া মুখ তুলিল, "কি?"

চন্দনদাস বলিল, "বলছি। আগে বলো দেখি, তুমি সাঁতার কাটতে জানো ?"

অবসাদ-ভরা স্বরে চুয়া বলিল, "জানি। তাই তো ডুবে মরতে পারিনি। কতবার সে চেষ্টা করেছি।"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, চুয়াকে বুকে জড়াইয়া লইয়া সান্ত্বনা দেয়; কিন্তু সে লোভ সংবরণ করিল, বলিল, "ও কথা ভুলে যাও, চুয়া, বুকে সাহস আনো। আমি এসেছি দেখেও তোমার সাহস হয় না ?"

চুয়া কেবল তাহার কালিমালিপ্ত চোখ দুটি তুলিয়া চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল; হয়তো নিজের একান্ত নির্ভরশীলতার কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। চন্দনদাস তখন সংক্ষেপে প্রাঞ্জলভাবে উদ্ধারের উপায় বিবৃত করিয়া বলিল; চুয়া ব্যগ্র বিস্ফারিতনয়নে শুনিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

চন্দনদাসের বিবৃতি শেষ হইলে চুয়া কিছুক্ষণ হেঁটমুখে নীরব হইয়া রহিল। লজ্জা করিবার সে অবকাশ পায় নাই, হৃদয়ের তুমুল আন্দোলনের মধ্যে এই তরুণ উদ্ধারকর্তাটিকে সে যে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছে তাহা নিজেই জানিতে পারে নাই। তাই উদ্ধারের আশা যখন তাহার সংশয়ময় চিত্তে আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিল, তখন, সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, চন্দনদাসের পায়ের উপর আছাড়িয়া পড়িল। দুই হাতে পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল, "একটা কথা বলো।"

চন্দনদাস চুয়ার মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "চুয়া, চুয়া, কি কথা ?"

"বলো, আমায় বিয়ে করবে ? তুমি আমায় প্রবঞ্চনা করছ না ?"

চন্দনদাস জোর করিয়া চুয়ার মুখ তুলিয়া তাহার চোখের উপর চোখ

রাখিয়া বলিল, "চুয়া, আমার মার নামে শপথ করছি, তোমাকে যদি বিয়ে না করি, যদি আমার মনে অন্য কোনও অভিসন্ধি থাকে তবে আমি কুলাঙ্গার।"

চুয়ার মাথা আবার মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তারপর সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, "তবে আমাকে এখনই নিয়ে যাচ্ছ না কেন?"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইতেছিল, এখনই এই কারাগার হইতে চুয়াকে মুক্ত করিয়া লইয়া পলায়ন করে; কিন্তু সুবুদ্ধি নিষেধ করিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বড় বেশি। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না—এখন ভরসা হয় না। বাড়ির দোরে পাহারা—যদি ওরা জেগে ওঠে—। কিন্তু আমার এখানে আর থাকা বোধ হয় নিরাপদ নয়—চাঁপার ঘুম ভাঙতে পারে।"—বলিয়া চন্দনদাস অনিচ্ছাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চুয়ার মনে আবার ভয় প্রবেশ করিল। সম্মুখে সমস্ত দিন পড়িয়া আছে; কি জানি কি হয়! সে ভয়-কাতর চক্ষু দুটি তুলিয়া বলিল, "যাচ্ছ?—কিন্তু—"

"কোনও ভয় নেই, চুয়া।"

"কিন্তু—যদি বিঘ্ন হয়—যদি—একটা জিনিস দিতে পারবে?"

"কি?"

"একটু বিষ। যদি কিছু বিঘ্ন হয়—"

চন্দনদাস কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে নিজের চুল হইতে সেই কাঁটা বাহির করিয়া দিল। গাঢ়স্বরে বলিল, "চুয়া, যদি দেখ কোনও আশা নেই তবেই ব্যবহার ক'রো, তার আগে নয়।"—বলিয়া কাঁটার ভয়ংকর কার্যকারিতা বুঝাইয়া দিল।

এতক্ষণে চুয়ার মুখের হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রোজ্জ্বল চক্ষে বলিল, "আর আমি ভয় করি না।"

চন্দনদাসের মুখে কিন্তু হাসির প্রতিবিম্ব পড়িল না। সে চুয়ার দুই হাত লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল, "চুয়া—"

বাক্‌পটু চন্দনদাস ইহার অধিক আর কথা খুঁজিয়া পাইল না।

চুয়া অশ্রু-আর্দ্র হাসিমুখে একবার চন্দনদাসের বুকের উপর রাখিল, অস্ফুটস্বরে কহিল, "চুয়া নয়—চুয়া-বৌ। এই আমাদের বিয়ে।"

ঘরের বাহিরে আসিবার পর একটা কথা চন্দনদাসের মনে পড়িল, সে বলিল, "ঠান্‌দির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে ব'লো—কাল সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে পালিয়ে যেন নিমাই পণ্ডিতের বাড়িতে যায়। সেখানে দু'এক দিন লুকিয়ে থাকবে, তারপর আমি তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।

গ্রীষ্মের হ্রস্ব রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিতেছে। কাক-কোকিল ডাকে নাই, কিন্তু বাতাসে আসন্ন প্রভাতের স্পর্শ লাগিয়া আছে, পূর্বাকাশে শুকতারা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া চন্দনদাস আর একবার চুয়ার দুই হাত নিজের বুকে চাপিয়া লইল। তারপর যে ভাবে আসিয়াছিল, সেই ভাবে ছায়ামূর্তির মতো বাহির হইয়া গেল।

পাইক দুই জন শেষ রাত্রির গভীর ঘুম ঘুমাইতে লাগিল।

অমাবস্যার সংশয়পূর্ণ দিবস ধীরে ধীরে ক্ষয় হইয়া আসিল। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিল না। কেবল দ্বিপ্রহরে মাধব চুয়ার গৃহে আসিয়া

তদারক করিয়া গেল ও জানাইয়া গেল যে, তাহার প্রদত্ত শাস্ত্রীয়-বিধান যেন যথাযথ পালিত হয়।

এখানে চাঁপার কাজ শেষ হইয়াছিল; মাধবের অনুমতি পাইয়া সে প্রমোদ-উদ্যানে পূজার আয়োজন করিতে গেল।

সায়াহ্নে নবদ্বীপের ঘাটে স্নানার্থীর বিশেষ ভিড় ছিল না। দুই চারি জন নারী গা ধুইয়া যাইতেছিল, কেহ কেহ কলসে ভরিয়া গঙ্গাজল লইয়া যাইতেছিল। পুরুষের সংখ্যা অল্প। কেবল্ এক জন পুরুষ অধীরভাবে সোপানের উপর পদচারণ করিতেছিল ও মাঝে মাঝে স্থির হইয়া উৎকর্ণভাবে কি শুনিতেছিল। তাহার গলায় মুক্তাহার বিলম্বিত—অন্যথা সাধারণ বাঙালীর বেশ। বলা বাহুল্য, সে চন্দনদাস।

ক্রমে সূর্য নদীর পরপারে অস্তমিত হইল। নিদাঘকালের দ্রুত সন্ধ্যা যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া আসিয়া ভাগীরথীর জলে ধূসর ছায়া বিছাইয়া দিল। পাশে নৌকাঘাট নির্জন ও নিস্তব্ধ। জেলে-ডিঙ্গি একটিও নাই। দুই একখানি স্থূলকলেবর মহাজনী কিস্তি নিঃসঙ্গ অসহায়ভাবে বিস্তীর্ণ ঘাটে লাগিয়া আছে।

গঙ্গাবক্ষেও নৌকা নাই। কেবল দূরে উত্তরে একটি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসিতেছে। অস্পষ্ট আলোকে মনে হয়, একটি লোক দাঁড় ধরিয়া তাহাতে বসিয়া আছে।

ক্রমে ডিঙ্গি মাঝগঙ্গা দিয়া ঘাটের সম্মুখীন হইল; কিন্তু ঘাটের নিকটে আসিল না, গঙ্গাবক্ষে স্থির হইয়া রহিল। নৌকারূঢ় ব্যক্তি মাঝে মাঝে দাঁড় টানিয়া নৌকা ভাসিয়া যাইতে দিল না।

চন্দনদাস চিন্তিতমুখে অধীরপদে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—ঐ আসিতেছে। পথে দূরাগত বাদ্যোদ্যম শুনা গেল।

চন্দনদাস একবার গঙ্গাবক্ষস্থ ডিঙ্গির দিকে তাকাইল, তারপর স্পন্দিতবক্ষে একটা গোলাকার বুরুজের উপর গিয়া বসিল।

বাদ্যধ্বনি ক্রমশঃ কাছে আসিতে লাগিল। মহারোলে কাঁসর-ঘণ্টা শিঙা-ঢোল বাজিতেছে। তামাসা দেখিবার জন্য বহু স্ত্রী-পুরুষ-বালক জুটিয়াছিল, তাহাদের কলরব সেই সঙ্গে মিশিয়া কোলাহল তুমুল হইয়া উঠিয়াছে।

ঘাটের শীর্ষে আসিয়া কোলাহল থামিল; বাজনা বন্ধ হইল। চন্দনদাস দেখিল, কৌতূহলী জনতাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুই সারি ঢাল-সড়কিধারী পাইক নামিয়া আসিতেছে। তাহাদের দুই সারির মধ্যস্থলে মুক্তকেশী জবামাল্য-পরিহিতা চুয়া। চন্দনদাসও কৌতূহলী দর্শকের মতো দাঁড়াইয়া উঠিয়া এই বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

পাইকগণ সদম্ভে অস্ত্র আস্ফালন করিয়া দর্শকদের ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ঘাটের দিকে নামিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যবর্তিনী চুয়া মন্থরপদে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সোপান আরোহণ করিতে লাগিল।

তারপর চন্দনদাসের সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইল। নিমেষের দৃষ্টি-বিনিময়ে যে ইঙ্গিত খেলিয়া গেল, আর কেহ তাহা দেখিল না।

বুরুজের পাশ দিয়া যাইবার সময় চন্দনদাস অগ্রগামী পাইককে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ সর্দার, এ তোমাদের কিসের মিছিল?"

বদন সর্দার প্রশ্নকারীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকাইল, তাহার গলায় দোদুল্যমান মুক্তার হার দেখিল, তারপর রূঢ়স্বরে কহিল, "তোর অত খবরে দরকার কি?"

চন্দনদাস মুখে বিনীতভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "না না, তাই

জিজ্ঞাসা করছি। মনে মনে বলিল, "মালিক আর চাকরের রা দেখি একই রকম। দাঁড়াও, তোমার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করছি।"

পরবর্তী পাইকগণ সকলেই চোখ পাকাইয়া চন্দনদাসের দিকে তাকাইল; তাহার গলার লোভনীয় মুক্তাহার কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। দুর্দান্ত প্রভুর উচ্ছৃঙ্খল ভৃত্য—হারছড়া কাড়িয়া লইবার জন্য সকলেরই হাত নিশপিশ করিতে লাগিল।

জলের কিনারায় গিয়া পাইকের দল থামিল। চুয়া সোপান হইতে ঝুঁকিয়া গঙ্গাজল মাথায় দিল; তাহার ঠোঁট দুটি অব্যক্ত প্রার্থনায় একটু নড়িল। তারপর সে ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিল। প্রথমে এক হাঁটু, ক্রমে এক কোমর, শেষে বুক পর্যন্ত জলে গিয়া দাঁড়াইল। গলার মালা জলে ভাসাইয়া দিয়া ডুব দিল।

পাইকেরা কিনারায় কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া গল্প করিতে করিতে গোঁফে মোচড় দিতে লাগিল।

এই সময় একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটিল। চন্দনদাস ইতিমধ্যে বুরুজ হইতে নামিয়া পাইকদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ!"

একজন পাইক ফিরিয়া দেখিল, চন্দনদাসের গলার মুক্তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং মুক্তাগুলি সূতা হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঘাটের শানের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। সে লাফাইয়া আসিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিল। তাহাকে মুক্তা কুড়াইতে দেখিয়া বাকি কয়জন পাইক হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল। মুক্তার হরির লুট—এমন সুযোগ বড় ঘটে না। সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া মুক্তা চুনিতে লাগিল, ঠেলা খাইয়া চন্দনদাস বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িল।

পাইকেরা মুক্তা কুড়াইতেছে, দর্শকেরা তাহাদের ঘিরিয়া লুব্ধচক্ষে

দেখিতেছে। কেহ লক্ষ্য করিল না যে, এই অবকাশে চন্দনদাস গঙ্গায় নামিল। চুয়া তখন সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চুয়া ও চন্দনদাস পাশাপাশি সাঁতার কাটিয়া চলিল। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের কালো মাথা দুটি কেবল জলের উপর দেখা যাইতেছে। চুয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল, তাহার সিক্ত মুখের উচ্ছলিত হাসি চন্দনদাসকে পুরস্কৃত করিল।

তাহারা যখন ঘাট হইতে প্রায় চল্লিশ হাত গিয়াছে, তখন ঘাটে একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠিল। তারপর "ধর্ ধর্, পালাল, পালাল,—" বলিয়া কয়েক জন পাইক জলে লাফাইয়া পড়িল, কয়েক জন নৌকার সন্ধানে ছুটিল; কিন্তু নৌকা কোথায়? বদন সর্দার ষাঁড়ের মতো চেঁচাইতে লাগিল।

গঙ্গার বুকে যে ছোট্ট ডিঙ্গি ভাসিতেছিল, তাহা ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল। চন্দনদাস বলিল, "চুয়া, যদি হাঁপিয়ে পড়ে থাকো, আমার কাঁধ ধরো।"

চুয়া বলিল, "না, আমি পারব।"

চন্দনদাস পিছু ফিরিয়া দেখিল, যে পাইকগুলা জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহারা সজোরে সাঁতারিয়া আসিতেছে; কিন্তু তাহারা এখনও অনেক দূরে, নৌকা সম্মুখেই। কয়েক মুহূর্ত পরে দু'জনে একসঙ্গে গিয়া নৌকার কানা ধরিল।

নিমাই পণ্ডিত দাঁড় ছাড়িয়া চুয়াকে ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন। চন্দনদাস তাহার পরে উঠিল।

যে পাইকটা সর্বাগ্রে আসিতেছিল, সে প্রায় বিশ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে হাত তুলিয়া ভাঙা গলায় চিৎকার করিয়া কি একটা বলিল। প্রত্যুত্তরে চন্দনদাস উচ্চ হাসিয়া দু'খানা দাঁড় হাতে তুলিয়া লইল। নিমাই পণ্ডিতও দাঁড় হাতে লইলেন।

দুই জনে একসঙ্গে দাঁড় জলে ডুবাইয়া টানিলেন। প্রদোষের ছায়ালোকে ক্ষুদ্র ডিঙ্গি পাখীর মতো উড়িয়া চলিল।

নবদ্বীপ হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাবক্ষে চন্দনদাসের দুই সমুদ্রতরী নোঙর করা ছিল। অন্ধকারে তাহাদের একচাপ গাঢ়তর অন্ধকারের মতো দেখাইতেছিল।

রাত্রি এক প্রহরকালে ক্ষুদ্র নৌকা গিয়া চন্দনদাসের মধুকর ডিঙ্গার গায়ে ভিড়িল। মাঝিরা সজাগ ও সতর্ক ছিল; মুহূর্তমধ্যে সকলে বড় নৌকায় উঠিলেন।

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমার কাজ তো শেষ হ'ল, আমি এবার ফিরি।"

চন্দনদাস হাত যোড় করিয়া বলিল, "ঠাকুর, এত দয়া করলেন, একটু বিশ্রাম করে যান।"

নৌকায় দুইটি কুঠুরী—একটি মাণিকভাণ্ডার, অপরটি চন্দনদাসের শয়নকক্ষ। শয়নকক্ষের মেঝের রঙীন পক্ষল সূতীর আস্তরণ। ঘরে দীপ জ্বলিতেছিল; সকলে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। চুয়া এক কোণে জড়সড় হইয়া অর্ধশুষ্ক বসন গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাস তাড়াতাড়ি পেঁটারি হইতে নিজের একখানা ক্ষৌমবস্ত্র বাহির করিয়া চুয়ার গায়ে ফেলিয়া দিল। চুয়া কাপড় লইয়া পাশের ঘরে গেল।

নিমাই পণ্ডিত আস্তরণের উপর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; চুয়া প্রস্থান করিলে চন্দনদাস চুপিচুপি বলিল, "ঠাকুর, বিয়েটা আজ রাতেই দিয়ে দিলে ভালো হয়।"

নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "এত তাড়া কিসের ? বাড়ি গিয়ে বিয়ে ক'রো।"

চন্দনদাস ভারি ভালোমানুষের মতো বলিল, "না ঠাকুর, চুয়া যদি কিছু মনে করে ?—তা ছাড়া, নৌকোয় একটি বৈ শোবার ঘর নেই।"

নিমাই বলিলেন,—"কিন্তু বিয়ে দিই কি করে ? উপকরণ কৈ ?"

"ঠাকুর, আপনি পণ্ডিতমানুষ, সামান্য পুরুত তো নন। আপনি ইচ্ছে করলে শুধু হাতেই বিয়ে দিতে পারেন।"

নিমাই স্মিতমুখে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মন্দ কথা নয়। তুমি কন্যাকে হরণ করে এনেছ, সুতরাং তোমাদের রাক্ষস বিবাহ হ'তে পারে। রাক্ষস বিবাহে কোনও অনুষ্ঠানের দরকার নেই।"

চন্দনদাস মহা উল্লাসে উঠিয়া গিয়া চুয়ার হাত ধরিয়া লইয়া আসিল ; বলিল, "চুয়া, ঠাকুর এখনই আমাদের বিয়ে দেবেন।"

পট্টাম্বরপরিহিতা চুয়া নত-নয়নে রহিল। নিমাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চন্দনদাস নাছোড়বান্দা, আজই বিয়ে করে তবে ছাড়বে।" চুয়ার মুখে অরুণরাগ দেখিয়া বুঝিলেন তাহার অমত নাই। বলিলেন, "বেশ। ফুলের মালা তো হবে না, দু'ছড়া হার যোগাড় করো।"

পুলকিত চন্দনদাস মাণিকভাণ্ডার হইতে দুগাছা মুক্তার মালা বাহির করিয়া দিল। তখন বিবাহ-ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

নিমাই একটি হার চুয়ার হাতে দিয়া বলিলেন, "দু'জনে দু'জনের গলায় দাও।"

উভয়ে মালা-বদল করিল।

নিমাই বলিলেন, "ঈশ্বর সাক্ষী করে গঙ্গার বুকের উপর ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে আজ তোমরা স্বামী-স্ত্রী হলে। আশীর্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হোক্।"

উভয়ে নতজানু হইয়া ভক্তিপূত-চিত্তে এই দেবকল্প তরুণ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইল।

তারপর উঠিয়া চন্দনদাস বলিল, "ঠাকুর, এ বিয়ে লোকে মানবে তো?"

নিমাই পণ্ডিতের নাসা স্ফুরিত হইল, তিনি গর্বিতস্বরে বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত যে বিয়ের পুরুত, সে-বিয়ে অমান্য করে কে?"

চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের পদতলে একমুঠি মোহর রাখিয়া বলিল, "দেবতা, আপনার দক্ষিণা।"

নিমাই এইবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ঐটি পারব না।—যাক্, আজ উঠলাম। বুড়ীকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা শীগ্‌গির ক'রো। আর, বাড়ি গিয়ে যথারীতি লৌকিক বিবাহ ক'রো। অধিকন্তু ন দোষায়।"

"তা করব; কিন্তু ঠাকুর, আপনি ক্লান্ত, পাঁচ-ছ' ক্রোশ দাঁড় টেনে এসেছেন, আজ রাত্রিটা নৌকোয় কাটিয়ে গেলে হ'ত না?"

"না—আজই আমায় ফিরতে হবে। রাত্রিতে না ফিরলে মা চিন্তিত হবেন। তা ছাড়া, তোমার নৌকায় তো একটি বৈ ঘর নেই।"—বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

চন্দনদাস একটু লজ্জিত হইল।

তারপর সেই মসীকৃষ্ণ অমাবস্যার মধ্যযামে নিমাই পণ্ডিত ডিঙ্গিতে উঠিয়া একাকী নবদ্বীপের পানে ফিরিয়া চলিলেন। যতক্ষণ তাঁহার দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল, চুয়া ও চন্দন যোড়হস্তে তদ্গতচিত্তে নৌকার পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বাঘের বাচ্চা

পুনা গ্রাম হইতে প্রায় সাত-আট ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উপত্যকা হইতে বহু উর্ধ্বে গিরিসংকটের ভিতর দিয়া দুইজন সওয়ার নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতেছিল। চারিদিকেই উচ্চনীচ ছোটবড় পাহাড়ের শ্রেণী, —যেন কতকগুলা অতিকায় কুম্ভীর পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া তাল পাকাইয়া এই হেমন্ত অপরাহ্ণের সোনালী রৌদ্রে শুইয়া আছে। তাহারি মধ্যে পিপীলিকার মতো দুইটি প্রাণী সূর্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া ক্রমশঃ দীর্ঘায়মান ছায়া সম্মুখে ফেলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল।

এখান হইতে উপত্যকা দৃষ্টিগোচর নয়, পথেরও কোন চিহ্ন কোথাও বিদ্যমান নাই। চতুর্দিকে কেবল উলঙ্গ কর্কশ পাহাড়, মাঝে মাঝে দুই একটা খর্বাকৃতি কণ্টকগুল্ম। এই সকল চিহ্ন ছাড়া পথিককে বহু-দূরস্থ জনপদে পরিচালিত করিবার কোন নিদর্শন নাই,—অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ স্থানে দিক্‌ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

অশ্বারোহী দুইজন যে পথ দিয়া নামিতেছিল তাহাকে পথ বলা চলে না, বর্ষার জল চূড়া হইতে নামিবার সময় পর্বতগাত্রে যে উপলপিচ্ছিল প্রণালী রচনা করে, এ সেইরূপ একটি প্রণালী, পাহাড়ের শীর্ষ হইতে প্রায় ঋজুরেখায় পাদমূল পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

সওয়ার দুইজন ঘোড়ার বল্গা ছাড়িয়া দিয়া পরস্পর বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল, খর্বদেহ রোমশ পাহাড়ী ঘোড়া স্বেচ্ছামত সেই ঢালু বিপজ্জনক পথে সাবধানে অবতরণ করিতেছিল। এই স্থানে পথ এত বেশি ঢালু যে একবার অশ্বের পদস্খলন হইলে আরোহীর মৃত্যু অনিবার্য; কিন্তু সেদিকে আরোহীদের দৃষ্টি নাই।

আরোহীদের মধ্যে একজন প্রাচীন বয়স্ক; মাথার চুল ও গোঁফ পাকা, বর্ণ এত বয়সেও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। কপালের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শ্বেত-চন্দনের দুইটি রেখা বোধ করি জরাজনিত ললাট-রেখাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। মস্তকে শুভ্র কার্পাসবস্ত্রের উষ্ণীষ; দেহে তুলট্ আংরাখার ফাঁকে বাম স্কন্ধের উপর উপবীতের একাংশ দেখা যাইতেছে। চোখে-মুখে একটি দৃঢ় অচঞ্চল বুদ্ধির প্রভা। দেখিলেই বুঝা যায় ইনি একজন শাস্ত্রাধ্যায়ী অভিজাতবংশীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার হস্তে কোন অস্ত্র নাই, কিন্তু যেরূপ স্বচ্ছন্দ নিশ্চিন্ততার সহিত অবতরণশীল অশ্বপৃষ্ঠে অটল হইয়া বসিয়া আছেন, তাহাতে মনে হয় কেবল ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়াই ইনি জীবন অতিবাহিত করেন নাই।

দ্বিতীয় আরোহীটি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বয়স বোধ করি ষোল বৎসরও অতিক্রম করে নাই; দেহের বর্ণ শ্যাম, কিন্তু মুখের গঠন অতিশয় ধারালো। মৃদঙ্গ-সদৃশ মুখের মধ্যস্থলে শ্যেনচঞ্চুর মতো নাসিকা এই অল্প বয়সেই তাহার মুখে শিকারীর মতো একটা শাণিত তীব্রতা আনিয়া দিয়াছে। চক্ষু দু'টি বড় বড়, চক্ষুতারকা নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ; বালকসুলভ চঞ্চলতা সত্ত্বেও দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। ওষ্ঠের উপর ও চিবুকের নিম্নে ঈষন্মাত্র রোমরেখা দেখা দিয়াছে, তাহাও বর্ণের মলিনতার জন্য স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। ভ্রূ-যুগল সূক্ষ্ম ও দূরপ্রসারিত। সহসা এই বালকের মুখ দেখিলে একটা অপূর্ব বিভ্রম জন্মে, মনে হয় যেন একখানা তীক্ষ্ণধার বাঁকা কৃপাণ সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

মুখ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া দেহের প্রতি চাহিলে কিন্তু আরো চমক লাগে। মুখের মতো দেহের সৌষ্ঠব নাই, প্রস্থের তুলনায় দৈর্ঘ্যে দেহ অত্যন্ত খর্ব। প্রথমেই মনে হয়, অতিশয় বলশালী। কটি হইতে পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা জুতা পর্যন্ত প্রাণসার অথচ ক্ষীণ,

মৃগচরণের মতো যেন অতি দ্রুত দৌড়িবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কটি হইতে উর্ধ্বে দেহ ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া বক্ষস্থল এরূপ বিশাল আয়তন ধারণ করিয়াছে যে বিস্মিত হইতে হয়। আরো অদ্ভুত তাহার দুই বাহু; আজানুলম্বিত বলিলেও যথেষ্ট হয় না, সন্দেহ হয় ঘোড়ার পিঠে বসিয়া হাত বাড়াইলে মাটি হইতে উপলখণ্ড তুলিয়া লইতে পারে। তাহার উপর যেমন সুপুষ্ট তেমনি পেশীবহুল; দুই বাহু দিয়া কাহাকেও সবলে জড়াইয়া ধরিলে তাহার পঞ্জর ভাঙিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই বালক হাসিতে হাসিতে চতুর্দিকে চঞ্চল চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নামিতেছিল। ঘোড়ার রেকাব নাই, লাল রেশমের জরিমোড়া মোটা লাগামও ছাড়িয়া দিয়াছে, অথচ কম্বলের জিনের উপর এমন ভাবে বসিয়া আছে যেন সে আর ঘোড়া পৃথক নয়—কোন ক্রমেই তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না। বাম হস্তে আগাগোড়া লোহার ভারি বল্লমটা এমনি অবহেলা ভরে ধরিয়া আছে যেন পাগড়ির উপর খেলাচ্ছলে রোপিত শুকপুচ্ছটার চেয়েও সেটা হাল্কা।

ঘোড়া দুইটি পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আর একটা পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে, এবার সেইটাতে চড়িতে হইবে। সূর্য পিছনের উচ্চ পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করিল, শীঘ্রই তাহার আড়ালে ঢাকা পড়িবে।

বালক চতুর্দিকে চাহিয়া যেন প্রাণশক্তির আতিশয্যবশতঃই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল, "দাদো, প্রতিধ্বনি শুনবে? হোয়া হো হো হো হো! চুপ! এইবার শোনো।"

কয়েক মুহূর্ত পরেই তিন দিক হইতে ভৌতিক শব্দ ফিরিয়া আসিল—হোয়া! হো হো হো!

বালক অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উত্তর দিকের একটা উচ্চ

পর্বতশৃঙ্গ দেখাইয়া বলিল, "ঐটে সব চেয়ে দূরে! আওয়াজ ফিরে আসতে কত দেরি হ'ল দেখলে? চোখে দেখে কিন্তু বোঝা যায় না কোন্‌টা কাছে, কোন্‌টা দূরে। অন্ধকার রাত্রে পথ হারিয়ে গেলে প্রতিধ্বনি ভারি কাজে লাগে—না দাদো?"

বৃদ্ধ মৃদুহাস্যে উত্তর করিলেন, "তা লাগে; কিন্তু অন্ধকার রাত্রে এ-রকম জায়গায় পথ হারিয়ে যাবার তোমার কোন সম্ভাবনা আছে কি?"

বালক বলিল, "তা নেই। তুমি আমার চোখ বেঁধে দাও, দেখ আমি ঠিক পুনায় ফিরে যেতে পারব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সে আমি জানি। লেখাপড়ার দিকে তোমার একেবারে মন নেই, কেবল দিবারাত্রি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পেলেই ভালো থাকো। তোমার বাবা যখন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবেন, তখন যে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব তা জানি না।"

বালকের মুখে একটা দুষ্টামির হাসি খেলিয়া গেল, সে বৃদ্ধের দিকে আড়চোখে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদো, 'আলিফ' ভালো, না 'অ' ভালো? বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখা সুবিধে, না ডান দিক থেকে বাঁ দিকে?"

বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সে তুমি বুঝতে পারবে না। ষোল বছর বয়স হ'ল, এখনো নিজের নাম সই করতে শিখলে না। তোমার লেখাপড়ার চেষ্টা করাই বৃথা!—কিন্তু শিকারের দিকেও তো তোমার মন নেই দেখতে পাই। আজ সারাদিন ঘুরে একটা খরগোসও মারতে পারলে না।"

বালক আক্ষেপে হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, "খরগোস আমি মারতে পারি না, আমার ভারি মায়া হয়। ঐটুকু জানোয়ার, তার ওপর হিংসার লেশ তার শরীরে নেই—খালি প্রাণপণে পালাতে জানে।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কোন্ জানোয়ার মারতে চাও শুনি —বাঘ!"

উৎসাহ-প্রদীপ্ত চক্ষে কিশোর বলিল, "হ্যাঁ, বাঘ। এ পাহাড়ে বাঘ পাওয়া যায় না, দাদো?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, শুনেছি আরো দক্ষিণে পাহাড়ের গুহায় বাঘ আছে; কিন্তু তুমি বাঘ মারবে কি করে?"

কিশোর বলিল, "কেন, এই বল্লম দিয়ে মারব! মাটিতে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে মারব।

"ভয় করবে না?"

"ভয়!" বালকের উচ্চহাস্য আবার চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলিল। "আচ্ছা দাদো, ভয়, জিনিসটা কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো? সকলের মুখেই ওই কথাটা শুনতে পাই, কিন্তু ওটা যে কি পদার্থ তা বুঝতে পারি না। ভয় কি ক্ষুধার মতো একটা প্রবৃত্তি?"

দাদো বলিলেন, "ভয় কি তা বুঝতে পারবে, যেদিন প্রথম যুদ্ধে নামবে, যেদিন হাতিয়ারবন্দ্ শত্রুকে সামনে দেখতে পাবে।"

বালক কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

দাদো বলিলেন, "আমি বড় বড় বীরের মুখে শুনেছি যে তাঁরাও প্রথমে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ভয় পেয়েছেন। এতে লজ্জার বিষয় কিছু নেই; সেই ভয়কে জয় করাই প্রকৃত বীরত্ব।"

সূর্য গিরিশৃঙ্গের অন্তরালে অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভূমির উপর ছায়ার একটা সূক্ষ্ম যবনিকা পড়িয়া গেল। শুধু ঊর্ধ্বে নগ্ন গিরিকূট এবং আরো ঊর্ধ্বে নীল আকাশে একখণ্ড মেঘ সিন্দুরবর্ণ ধারণ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

দাদো নিজের অশ্ব সম্মুখে চালিত করিয়া কহিলেন, "আর দেরি নয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখনো দুটো পাহাড় পার হতে বাকি। পুনা পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।"

বালক তাঁহার অনুগামী হইয়া বলিল, "তা হ'লেই বা? আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে ঠিক নিয়ে যাব।"

দাদো বলিলেন, "রাত্রে এ-সব পাহাড়-পর্বত নিরাপদ নয়। শোনোনি, এদিকের গাঁয়ে-বস্তিতে আজকাল প্রায় লুঠ-তরাজ হচ্ছে?"

বালক ভারি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তাই নাকি? কৈ আমি তো শুনিনি। কারা লুঠ-তরাজ করছে?"

দাদো বলিলেন, "তা কেউ জানে না। বোধ হয় এই দিকের বুনো পাহাড়ী মাওলীরা ডাকাতি করছে। বিজাপুর এলাকার তিনটে বড় বড় গ্রাম গত চার মাসের মধ্যে লুঠ হয়ে গেছে। শুনতে পাই তাদের সর্দার একজন ছোকরা, লোহার সাজোয়া আর মুখোস পরে ঘোড়ায় চড়ে লুঠেরাগুলোকে ডাকাতি করতে নিয়ে যায়। ছোড়াটা নাকি ভয়ংকর কালো বেঁটে আর জোয়ান।"

বালক তাহার হাতের বল্লমটা খেলাচ্ছলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই নাকি? তুমি এত কথা কোথা থেকে জানলে, দাদো?"

দাদো পাহাড়ে ঘোড়া চড়াইতে চড়াইতে বলিলেন, "ও অঞ্চলের দেশমুখরা দরবারে নালিশ করতে এসেছিল। তাদের বিশ্বাস ডাকাতের সর্দার পুনার লোক।"

দাদোর পশ্চাতে বালকও পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা দরবার থেকে কি ব্যবস্থা করলে?"

দাদো বলিলেন, "কিছু করা হয়নি। দেশমুখদের তোমার বাবার কাছে বিজাপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

বালক পশ্চাতে থাকিয়া মিটিমিটি হাসিতেছিল, দাদো তাহা দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না।

পাহাড়ের পিঠের উপর উঠিয়া দুইজনে ক্ষণকাল পাশাপাশি দাঁড়াইলেন। এখানে আবার সূর্যকিরণ আসিয়া বালকের বল্লমের ফলায় যেন আগুন ধরাইয়া দিল।

সম্মুখের পাহাড়তলিতে তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে, নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বালক বলিল, "আচ্ছা দাদো, এখন যদি আমাদের ডাকাতে আক্রমণ করে, তুমি কি করো?"

দাদো ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার চতুর্দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি আর করি! তাদের সঙ্গে লড়াই করি।"

"তারা যদি পঞ্চাশজন হয়?"

"তা হ'লেও লড়ি।"

বালক বলিল, "কিন্তু সে যে ভারি বোকামি হবে, দাদো। পঞ্চাশজনের সঙ্গে লড়াই করে তুমি পারবে কেন?"

দাদো বলিলেন, "তাতে কি! না হয় লড়াই করতে করতে মরব।"

বালক বিস্মিত হইয়া বলিল, "কিন্তু এরকম মরে লাভ কি, দাদো?" তারপর মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি কিন্তু লড়ি না, তীরের মতো এই ধার বেয়ে পালাই। এত জোরে পালাই যে ডাকাতের বর্শা আমাকে ছুঁতেও পারবে না।"

ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাদো বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের ছেলে তুমি, দুষমনের সামনে থেকে পালাবে? এই না বলছিলে, ভয় কাকে বলে জানো না?"

বালক বলিল, "ভয়! পালানোর সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক কি? পালাব, কারণ পালালেই আমার সুবিধে হবে, পরে ডাকাতদের জব্দ করতে পারব। আর লড়ে যদি মরেই যাই, তাহ'লে তো ডাকাতদের জিত হ'ল।"

দাদো মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না না, এসব শিক্ষা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ? না লড়ে পালিয়ে যাওয়া ভয়ংকর কাপুরুষতা। যে বীর, সে কখনো পালায় না। রাজপুত বীরদের গল্প শোনোনি?"

বালক বলিল, "রাজপুতদের গল্প শুনলে আমার গা জ্বালা করে। তারা শুধু লড়াই করতে পারে, বুদ্ধি এতটুকু নেই। যিনি যতবড় বীর, তিনি ততবড় বোকা।"

দাদো খোঁচা দিয়া বলিলেন, "তুমিও তো রাজপুত! মায়ের দিক থেকে তোমার গায়েও তো যদুবংশের রক্ত আছে।"

বালক সবেগে শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিল, "না, আমি রাজপুত হ'তে চাই না, আমি মারাঠা।" বালকের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদো, তোমার কাছে তো বড় বড় যুদ্ধের গল্প শুনেছি, কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না। সম্মুখ-যুদ্ধ করার মানে কি?"

দাদো সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন, "সম্মুখ-যুদ্ধ মানে সামনা সামনি শক্তি পরীক্ষা। যার শক্তি বেশি সেই জিতবে!"

"আর যার শক্তি কম, সে যদি চালাকি করে জিতে যায়?"

"সে তো আর ধর্মযুদ্ধ হ'ল না।"

"নাই বা হ'ল! যুদ্ধে হার-জিতই তো আসল—ধর্মযুদ্ধ হ'ল কি না তা দেখে লাভ কি?"

দাদো অনেকক্ষণ বালকের জিজ্ঞাসু মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বিড় বিড় করিয়া বলিলেন, "বাপের স্বভাব ষোল আনা পেয়েছে, তেমনি ধূর্ত আর হুঁসিয়ার—সর্বদাই লাভ-লোকসানের দিকে নজর। আর শুধু বাপ কেন, বংশটাই ধূর্ত! মালোজী ভোঁস্‌লে যদি চালাকি করে যদুবংশের মেয়ে ঘরে না আনতে পারত, তাহ'লে ভোঁস্‌লে বংশকে চিনত কে? আর শাহুই বা এতবড় জায়গীরদার হ'ত কোথা থেকে?"

পলকের মধ্যে বালকের সংশয়প্রশ্নপূর্ণ মুখভাবের পরিবর্তন হইল। বালকোচিত কৌতূহলে দাদোর নিকটে সরিয়া গিয়া সানুনয়কণ্ঠে বলিল, দাদো, তুমি যে আমার মার বিয়ের গল্প বলবে বলেছিলে, কৈ বললে না? বলো না দাদো, কি করে ঠাকুর্দা যদুবংশী মেয়ে ঘরে আনলেন।"

এই সময় নিম্নের ছায়াচ্ছন্ন প্রদোষান্ধকার হইতে গাভীর হাম্বারব ভাসিয়া আসিল। বালক সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ শোনো, দেওরামের গরু ঘরে ফিরে এলো। চলো, চলো, দাদো, আর দেরি নয়; সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ভারি ক্ষিদে পেয়ে গেছে—এতক্ষণ তা লক্ষ্যই করিনি। দেওরামের মেয়ে মুন্নার সঙ্গে সেই যে সকালবেলা তেঁতুলবনের ধারে দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল ফেরবার সময় তাজা দুধ খাওয়াবে। জয় ভবানী!"

বালক দুই পা দিয়া ঘোড়ার পেট চাপিয়া ধরিতেই ঘোড়া লাফাইয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পার্বত্য হরিণের মতো পাথর হইতে পাথরের উপর ধাপে ধাপে লাফাইয়া পড়িয়া বিদ্যুদ্বেগে নিচের দিকে অদৃশ্য হইল।

দাদো বালকের উচ্চ কণ্ঠস্বর দূর হইতে শুনিতে পাইলেন, "চলে এসো দাদো, দেওরামের ঘর ঝর্ণাতলার টালের উত্তর দিকে কুলগাছের

জঙ্গলের মধ্যে ; যদি খুঁজে না পাও, হাঁক দিও—ঝুম্মা এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।”

বৃদ্ধ পর্বত অবতরণ করিয়া বদরীবনের মধ্যে যখন দেওরামের কুটীর অঙ্গনে পৌছিলেন, তখন দেখিলেন একটি বারো-তেরো বছরের মাওলী চাষার মেয়ে একটা ক্ষুদ্রকায় গাভীকে দোহনের চেষ্টা করিতেছে এবং বালক ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে সেই দৃশ্য দেখিতেছে। গাভীটা বোধ হয় অপরিচিত ব্যক্তি ও ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, তাই কিছুতেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে দিতেছে না, চেষ্টা করিবামাত্র সরিয়া সরিয়া যাইতেছে।

মেয়েটি বিব্রত হইয়া বলিল, “তুমি ওর শিং দুটো একবার ধরো না, নইলে বজ্জাত গরু কিছুতেই দুইতে দেবে না।”

বালক গরুর শিং ধরিবার কোন চেষ্টা না করিয়া তামাসা করিয়া বলিল, “তুই কেমন মাওলার মেয়ে—গাই দুইতে জানিস্ না? দাঁড়া, বিশুয়াকে বলে দেব, সে আর তোকে বিয়ে করবে না।”

ক্ষুব্ধ লজ্জায় ঝুম্মা এতটুকু হইয়া গিয়া বলিল, “তোমার ঘোড়া দেখেই তো আজ ও অমন করছে, নইলে আমিই তো রোজ দুই।”

বালক মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া বলিল, “হ্যাঁ, দুই! আর বড়াই করতে হবে না। দে আমায় ঘটি, আমি দুয়ে দিচ্ছি।”

ঝুম্মা বলিল, “তুমি পারবে না। আমি আর বাবা ছাড়া কেউ ওকে দুইতে পারে না। তোমাকে ও এখনি ফেলে দেবে।”

বালকের আত্মাভিমানে ভীষণ আঘাত লাগিল, সে তর্জন করিয়া বলিল, “কি! ফেলে দেবে! দেখি তো কেমন তোর গরু? দে ঘটি।”

ঝুম্মার হাত হইতে জোর করিয়া ঘটি কাড়িয়া লইয়া বালক দুগ্ধ দোহন করিতে বসিল। গরুটা ঘাড় বাঁকাইয়া একবার দোহনকারীকে

দেখিয়া লইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু বালকও ছাড়িবার পাত্র নয়, ঘটি লইয়া মুখে নানাপ্রকার প্রীতিসূচক শব্দ করিতে করিতে তাহার পশ্চাতে ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে কি মনে করিয়া গাভীটা দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন বালক সন্তর্পণে তাহার দেহে হাত বুলাইয়া দিয়া গাভীর পশ্চাদ্দিকে বসিয়া দুই জানুর মধ্যে ভাণ্ডটি ধরিয়া যেমন গাভীর উধসের দিকে হাত বাড়াইয়াছে, অমনি গাভী এক চরণ তুলিয়া তাহাকে এরূপ সবেগে পদাঘাত করিল যে বালক ভাণ্ডসমেত চিৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

নুন্না কলকণ্ঠে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। গাভীটা যেন কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রোমন্থন করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ দাদো অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বালকের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেগেছে নাকি?"

বালক অঙ্গের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "গরু নয়—ঘোড়া। গরু কখনো অমন চাট ছোড়ে? নে নুন্না, তোর ঘটি, আমি ঘোড়ার দুধ খেতে চাই না। বাড়ি চললুম।"

বালক অশ্বপৃষ্ঠে উঠিতে যায় দেখিয়া নুন্না মিনতি করিয়া বলিল "আ একটু দাঁড়াও না, বাবা এলো বলে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে বলছিলে— ঘরে বজরার রুটি আছে, এনে দেব?"

বালক বলিল, "না, তোর রুটি-দুধ—কিছু খেতে চাই না। আমি চললুম।"

এমন সময় কুটীরের পশ্চাতের ঘন ঝোপের ভিতর হইতে দুইটি লোক বাহির হইয়া আসিল। একজন খর্বকায় বৃষস্কন্ধ মধ্যবয়স্ক লোক, অপরটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের দৃঢ়শরীর যুবা। হাতের বল্লম কুটীরের গায়ে হেলাইয়া রাখিয়া মধ্যবয়সী লোকটি দ্রুতপদে আসিয়া বালকের

ঘোড়ার রাশ ধরিল। বালক তখন ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিয়াছে, লোকটি সানুনয় নিম্নকণ্ঠে বলিল, "রাজা, ঘোড়া থেকে নামো, দুধ না খেয়ে যেতে পাবে না।"

যুবকটিও এতক্ষণে সসম্ভ্রম হাস্যোদ্ভাসিত মুখে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বালক একলম্ফে ঘোড়া হইতে নামিয়া দৌড়িয়া গিয়া নুন্নার চুলের মুঠি ধরিল, তাহাকে চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে যুবকের সম্মুখে লইয়া গিয়া প্রায় তাহার বুকের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নে বিশুয়া, এটাকে তুই ঘরে নিয়ে যা, তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিলুম। যদি বজ্জাতি করে, খুব পিটবি। আর ওই হতভাগা গরুটাকেও তুই নিয়ে যা, ওটা হ'ল তোর বিয়ের যৌতুক।"

নুন্না বালকের হাত ছাড়াইয়া কুটীরের ভিতর পলাইয়া গেল। বিশুয়া হাসিতে হাসিতে হেঁট হইয়া বালকের পদস্পর্শ করিয়া বলিল, "তুমি যখন দিলে রাজা, তখন আর আমার ভাবনা কি! এবার ঘোড়ার পিঠে তুলে ওকে ঘরে নিয়ে যাব। কি বলো দেওরাম?"

দেওরাম গম্ভীর ভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "তা যাস্। রাজা যখন তোর হাতে নুন্নাকে দিয়েই দিয়েছে, তখন আর আমি কি বলব? আর, আমি নুন্নার মন জানি, সেও তোকেই বিয়ে করতে চায়।"

এই সময় নুন্নার হাসিমুখ কুটীরের ভিতর হইতে পলকের জন্য দেখা গেল। সে সশব্দে কুটীর-দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দেওরাম ভূপতিত ঘটিটা তুলিয়া লইয়া দুগ্ধ-দোহনে প্রবৃত্ত হইল। গাভীটা এবার আর কোন আপত্তি করিল না।

বৃদ্ধ দাদো এতক্ষণ অদূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতে-ছিলেন। তাহার মুখে সংশয় ও সন্দেহের ছায়া ঘনীভূত হইতেছিল। এই নির্জন বনের মধ্যে একটিমাত্র কুটীর, তাহার অধিবাসী এই ভীমকায়

দেওরাম। ইহারা কে এবং বালকের সহিত ইহাদের পরিচয় হইল কিরূপে ?

তিনি অগ্রসর হইয়া বিশুয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এঁকে চিনলে কি করে ?"

নিমেষের জন্য বিশুয়া ও বালকের চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। বিশুয়ার মুখ ভাবলেশহীন হইয়া গেল, সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "দরবারে ওঁকে দেখেছি, উনি জাগীরদারের ছেলে।"

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধভাবে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা ওঁকে রাজা বলে ডাকছ কেন ?"

বিশুয়া কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, দুগ্ধদোহন করিতে করিতে দেওরাম জবাব দিল, "জাগীরদারের ছেলে, উনিই একদিন মালিক হবেন, তাই রাজা বলে ডাকি।"

দাদো উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন, "ইনি জায়গীরদারের মেজো ছেলে তাও জানো না ? যে যাক্—" বালকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তুমি এদের চিনলে কি করে জিজ্ঞাসা করি ?"

বালক অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর করিল, "শিকার করতে এসে এদের সঙ্গে ভাব হয়েছে, দাদো। তুমি তো আর প্রত্যেকবার আমার সঙ্গে আসো না, তাই জানো না। কতবার শিকার করে ফেরবার মুখে দেওরামের জোয়ারী রুটি খেয়েছি—দেওরাম আমাকে ভারি যত্ন করে।"

দাদো বালকের ছলনাহীন মুখের দিকে কিয়ৎকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া শুধু কহিলেন, "হুঁ।" মনে মনে ভাবিলেন,—তোমার গতিবিধির উপর এখন হইতে একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ব্যাপার ঠিক বুঝা যাইতেছে না।

ধারোষ্ণ দুগ্ধের পাত্র আনিয়া দেওরাম বালকের হাতে দিল। বালক জিজ্ঞাসা করিল, "দাদো, তুমি খাবে না?"

দাদো কহিলেন, "না, তুমি খাও। আমার এখনো আহ্নিক বাকি।"

দুগ্ধপাত্র দুই হস্তে ধরিয়া বালক অদূরে একটি শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। দেওরামও তাহার অনুবর্তী হইয়া পাশে গিয়া দাঁড়াইল। এক চুমুক দুগ্ধ পান করিয়া বালক অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকাইয়া নিম্নস্বরে বলিল, "পরশু অমাবস্যা।"

দেওরামও অলসভাবে উর্ধ্বে দৃষ্টি করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "হ্যাঁ। লোক সব তৈরি আছে। কোথায় থাকতে হবে?"

"রাক্ষসমুখো গুহার মধ্যে। আমি দেড় পহর রাত্রে আসব। পঁচিশ জনের বেশি লোক যেন না হয়।"

"বেশ। এবার কোন্ দিকে যাওয়া হবে?"

"উত্তর দিকে। দক্ষিণে আর নয়, সেদিকে বড় হৈচৈ হয়েছে। দরবার পর্যন্ত খবর গেছে।"

দাদো তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া দেওরাম প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা। হরিণ কিন্তু এ দিকে পাওয়া যায় না।"

বালক বাকি দুগ্ধটুকু নিঃশেষে পান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজভাবে বলিল, "আজ তাহ'লে চললুম, দেওরাম। মুন্নার বিয়ের দিন আমাকে খবর দিও—আমি দাদোকে নিয়ে আসব। দাদো একজন ভারি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জানো তো? উনিই মুন্নার বিয়ে দেবেন।"

ঘোড়ার পিঠে একলাফে উঠিয়া বালক বলিল, "আর যদি হরিণছানা পাও, পুনায় নিয়ে যেও। আর দেরি করব না, রাত হয়ে এলো। দাদোর আবার ভারি ডাকাতের ভয়!"

বিশুয়া ও দেওরাম দাঁড়াইয়া রহিল, অশ্বারোহী দুইজনে বদরীকানন পার হইয়া ঝর্ণার সঞ্চিত অগভীর ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাশ দিয়া আবার পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। এইটি শেষ পাহাড়—ইহার পরই উপত্যকা। কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না, দুইজনেই স্ব স্ব চিন্তায় মগ্ন। এদিকে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে। ঘোড়া দু'টি সতর্কভাবে পর্বতগাত্র আরোহণ করিতেছে।

হঠাৎ চমক ভাঙিয়া বালক দাদোর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল দাদো তাহারই মুখের প্রতি সন্দেহাকুল চক্ষে চাহিয়া আছেন। বালক অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তারপর জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি দেখছ দাদো? এবার আমার মার বিয়ের গল্প বলো।"

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আপনার মনে বলিলেন, "বংশের ধারা বদলানো যায় না; বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়, শৃগাল হয় না—ঈশ্বরের এই বিধান। কে জানে, হয়তো এর মধ্যে মঙ্গলেরই বীজ নিহিত আছে।"

বালক তাঁহাকে দীর্ঘকাল চিন্তা করিবার অবকাশ না দিয়া পুনশ্চ কহিল, "বলো না দাদো?"

দাদো আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "গল্প অতি সামান্যই; কিন্তু তোমার ঠাকুর্দা মালোজী ভোঁস্‌লে যে কি রকম চতুর ছিলেন, এই গল্প থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।"

"তোমার মাতুলবংশের মতো এতবড় বিখ্যাত যশস্বী বংশ দাক্ষিণাত্যে খুব অল্পই আছে। আজ থেকে নয়, চারশো বছর আগে আলাউদ্দিন খিলিজির আমল থেকে দেবগিরির যদুবংশের নাম দাক্ষিণাত্যের পাথরে পাথরে তলোয়ার দিয়ে খোদাই হয়ে আসছে।

"অতীতের কোন্ যুগে এই যদুবংশ রাজপুতানা থেকে এসে

দেওগিরিতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে কাহিনী লুপ্ত হয়ে গেছে। দেওগিরির রাজ্যও আর নেই; কিন্তু বীরত্বে, ধর্মনিষ্ঠায়, মহানুভবতায় এই বংশ আজ পর্যন্ত হিন্দুমাত্রেরই আদর্শ হয়ে আছে।

"এ-হেন বংশে তোমার দাদামশায় লখুজী যদুরাও একজন পরাক্রমশালী মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন। দশ হাজার সিপাহী নিত্য তাঁর রুটি খেত। বিজাপুর-গোলকুণ্ডা তাঁকে যমের মতো ভয় করত, আমেদনগর রাজ্যের তিনি ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। মালিক অম্বর যদি তাঁর সঙ্গে কপটাচারিতা না করত—কিন্তু সে অন্য কথা। এখন আসল গল্পটা বলি।

"সে আজ বহুদিনের ঘটনা, তখন আমার বয়স দশ-এগারো বছরের বেশি নয়; কিন্তু সেদিনকার প্রত্যেক ঘটনাটি স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন ছিল ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী, রাজপুতদের একটা মস্ত উৎসবের দিন। দাক্ষিণাত্যে দোলপূর্ণিমার দিন আবীর খেলার প্রথা এই যদুবংশই প্রচার করেছিলেন। সেদিন দেশের সমস্ত গণ্যমান্য লোক, এমন কি বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আমেদনগর দরবারের বড় বড় হিন্দু আমীর-ওমরা এসে লখুজীর কেল্লার মতো বিশাল ইমারতে জমা হতেন। সমস্ত রাত্রিদিনব্যাপী উৎসব চলত, ফাগ, রং এবং সুরার স্রোত বয়ে যেত।

"সেবার লখুজীর প্রকাণ্ড প্রাসাদের দরবার-ঘরে মজলিস বসেছে। মেঝের ওপর পাশা গালিচা পাতা, তার ওপর অনেকে বসেছেন; দরবার লোকে লোকারণ্য। সিপাহী থেকে সর্দার পর্যন্ত সকলের অবাধ যাতায়াত। সামান্য সৈনিক পাঁচহাজারী সর্দারের মুখে আবীর মাখিয়ে দিচ্ছে, মনসবদার সিপাহীকে মাটিতে ফেলে তার মুখে মদ ঢেলে দিচ্ছে। হাসির হর্‌রা ছুটছে। ছোট বড়, উচ্চ নীচ কোনো প্রভেদ নেই, এই একদিনের জন্যে সকলে সমান। সবাই আমোদে মত্ত।

"সভার মাঝখানে মস্তবড় একটা চাঁদির থালায় আবীর স্তূপীকৃত

রয়েছে, সেই থালা ঘিরে প্রধান প্রধান অতিথিরা বসেছেন। পানদান, গুলাবপাশ, আতরদান চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। স্বয়ং লখুজী এখানে আসীন; তোমার ঠাকুর্দা মালেজীও আছেন। মালোজী তখন লখুজীর অনুগৃহীত একজন সামান্য সর্দার মাত্র; কিন্তু তাঁর কূটবুদ্ধি ও রণনৈপুণ্যের জন্যে লখুজী তাঁকে ভারি স্নেহ করতেন। তাই মালোজীও সাহস করে এই সভায় এসে বসেছেন। সকলের মুখেই আবীরের প্রলেপ, দেহের বস্ত্র এবং মিরজাই রঙে রক্তবর্ণ, চক্ষু ঢুলুঢুলু! এখানে গানের মজলিস বসেছে; আরো অনেক লোক চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গান শুনছে এবং মজা দেখছে।

"গান গাইছেন আমেদনগরের একজন বুড়ো ওমরা—তাঁর নাম ভুলে গেছি। মস্ত ওস্তাদ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। গড়গড়া টানতে টানতে হঠাৎ তিনি বসন্তরাগের এক তান মারলেন—সুরের ধমকে পাকা গোঁফ থেকে একরাশ আবীর উড়ে গেল। তোমার ঠাকুর্দা মালেজী সারঙ্গী কোলে করে ওস্তাদের পিছনে বসে ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংগত আরম্ভ করলেন। লখুজী নিজে মৃদংগ বাজাতে লাগলেন।

"গান থামলে প্রশংসাধ্বনির একটা ঝড় বয়ে গেল, লখুজী পাখোয়াজ ফেলে প্রায় এক তোলা অম্বুরী আতর পলিতকেশ গায়কের গোঁফে মাখিয়ে দিয়ে দাড়ি ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, 'কৎল্ কিয়া বিবি! আর একঠো ফর্মাও!'

"বৃদ্ধ দন্তহীন হাসি হেসে চোখ ঠেরে আবার গান ধরলেন, 'চোলিমে ছিপাউঁ কৈসে যোবনা মোরি'।

"বিরাট হাসির একটা হল্লা পড়ে গেল। লখুজী ওস্তাদকে কোলে তুলে নিয়ে নৃত্য সুরু করে দিলেন।—কি আনন্দের দিনই গিয়েছে; এখন সব স্বপ্ন বলে মনে হয়।"

দাদো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ঘোড়া দুইটি ইতিমধ্যে পর্বত পার হইয়া উপত্যকায় নামিয়া আসিয়াছে, কিন্তু পথ এখনো শিলা-সংকুল। আশে-পাশে মাটি ফাটিয়া বড় বড় খাদ রচনা করিয়াছে। শুষ্ক পয়ঃপ্রণালীর মতো এই খাদগুলি অন্ধকারে বড়ই বিপজ্জনক, ঘোড়া একবার পা ফস্কাইয়া উহার মধ্যে পড়িলে কোথায় অন্তর্হিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এদিকে দিবার দীপ্তিও সম্পূর্ণ নিবিয়া গিয়াছে, কেবল সম্মুখে বহুদূরে পুনার দীপগুলি মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

বালক একাগ্রমনে গল্প শুনিতেছিল, দাদো থামিতেই সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া বলিল, "তার পর?"

দাদো বলিলেন, "হুঁসিয়ার হয়ে পথ চলো, রাস্তা বড় খারাপ।" তারপর গল্প আরম্ভ করিলেন, "দু'টি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এই দরবার ঘরের চারিদিকে খেলা করে বেড়াচ্ছিল, দু'জনেরই লাল বেনারসী চেলির জোড় পরা, কানে কুণ্ডল, হাতে বালা, গলায় হার। ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর, আর মেয়েটির তিন।

"এদের দিকে কারো দৃষ্টি ছিল না, এরা নিজের মনে ঘরময় খেলে বেড়াচ্ছিল। কখন্ এক সময় মেয়েটি দূর থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল, গম্ভীর মুখে ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আধ আধ ভাষায় প্রশ্ন করলে, 'তুমি কে'?

"ছেলেটিও মেয়েটির দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে বললে, 'আমি শাহু। আমি তীর ছুড়তে পারি। তুমি কে?'

"মেয়েটির দুই চক্ষু সম্ভ্রমে ভরে উঠল, সে ফুলের মতো ঠোঁট দুটি খুলে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললে, 'আমি দিদা।' তারপর একটু ভেবে আবার বললে, 'আমার বাবাও তীর ছুড়তে পারে।'

"অতঃপর এই বীর এবং বীরকন্যার মধ্যে ভাব হতে বেশি দেরি হ'ল না। শাহু গিয়ে মেয়েটির গলা জড়িয়ে নিলে, মেয়েটিও শাহুর কোমর জড়িয়ে ধরলে। এইভাবে তারা অনেকক্ষণ দরবার-ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদের মধ্যে চুপিচুপি কি কথা হ'ল তারাই জানে। খুব সম্ভব শাহু তার অসামান্য শৌর্য-বীর্যের কথা খুব ফলাও করে ব্যাখ্যা করে মেয়েটির ছোট্ট প্রাণটুকু জয় করে নিচ্ছিল। আর মেয়েটিও বোধ হয় নিঃসংশয় সহানুভূতি এবং প্রশংসা দ্বারা শাহুর বীর-হৃদয় সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলছিল।

"এদিকে গানের মজলিশ তখন ঢিলে হয়ে এসেছে; বৃদ্ধ গায়ক তিন পাত্র গুলাবি সরবত খেয়ে কিংখাপের তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছেন,—এমন সময় এই দুটি ছেলেমেয়ে গলা-জড়াজড়ি করে তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। এতগুলো লোক চারিপাশে বসে আছে, কিন্তু সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজেদের কথাতেই তারা মশগুল। বৈঠকে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি একসঙ্গে তাদের ওপর গিয়ে পড়ল। এ কি অপূর্ব আবির্ভাব! আজ দোলের দিনে সত্যিই কি বৃন্দাবন-লীলা তাঁদের চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছে? সকলে চোখ মুছে দেখলেন,—তাই তো! ছেলেটির বর্ণ নবজলধরশ্যাম, আর মেয়েটি বিদ্যুল্লতার মতো গৌরী!

"মেয়েটির হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, সে আতরদানে তার ছোট্ট চাঁপার কলির মতো আঙুল ডুবিয়ে শাহুর নাকের নিচে আঙুলটি বুলিয়ে দিলে। শাহুও আদর-আপ্যায়নে কম যাবার পাত্র নয়, সে চাঁদির থালা থেকে এক মুঠি আবীর তুলে নিয়ে সযত্নে মেয়েটির মুখে কপালে মাখিয়ে দিলে।

"সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলেন, 'রাধা-গোবিন্দজী কি জয়!'

"লখুজী আর মালোজী ছাড়া আর কেউ জানতেন না এ ছেলেমেয়ে

ছুটি কে। লখুজী উচ্চহাস্য করে উঠলেন, তারপর দু'টিকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের কোলে বসিয়ে বললেন,—'রাধাগোবিন্দজী নয়, এরা আমার মেয়ে আর মালোজীর ছেলে। বন্ধুগণ, এ দু'টির বিয়ে হ'লে কেমন মানায় বলুন তো ?'

"লখুজী পরিহাসচ্ছলেই কথাটা বলেছিলেন, তা ছাড়া গুলাবি সরবতের নেশাও অল্পবিস্তর ছিল। তাঁর কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন, কিন্তু মালোজী ভোঁসলে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে করজোড়ে সকলকে বললেন,—'মহাশয়গণ, আপনারা সাক্ষী থাকুন, লখুজী তাঁর কন্যাকে আমার পুত্রের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা করলেন।'

"সকলে অবাক হয়ে রইলেন, লখুজীর নেশা ছুটে গেল। তাঁর মুখ আবীর-প্রলেপের ভিতর থেকে ক্রোধে কালো হয়ে উঠল। তাঁর মেয়েকে—দেবগিরির রাজবংশের মেয়েকে যে মালোজীর মতো একজন সামান্য প্রাণী নিজের পুত্রবধূ করবার স্পর্ধা করতে পারে, এ তাঁর কল্পনারও অতীত; কিন্তু তবু কথাটা যে তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়ে গেছে এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। মালোজীর দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে লখুজী বললেন, 'মালোজী, তুমি পাগলের মতো কথা বলছ। আমার মেয়ে রাজার ঘরে পড়বে।'

"মালোজী পূর্ববৎ জোড়করে বললেন, 'আমার ছেলে আপনার মেয়ের মুখে আবীর দিয়েছে, আপনার মেয়ে আমার ছেলের মুখে আতর দিয়েছে, তারপর আপনি তাদের কোলে নিয়ে যা বলেছেন তা উপস্থিত সকলেই শুনেছেন। ধর্মতঃ, আপনার মেয়ে আমার ছেলের বাগ্‌দত্তা। এখন যদি আপনি সে কথা প্রত্যাহার করতে চান, করুন, আমার আপত্তি নেই।'

"ক্রোধে লখুজী আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে তাঁর

কথা বেরুল না। একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু তাঁদের মনোভাব বুঝতেও বিলম্ব হ'ল না; সকলেই নীরবে মালোজীর কথার সমর্থন করছেন। লখুজী নিজের মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে ঝড়ের মতো অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

"মালোজীও ছেলে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে লখুজীর মেয়ে প্রকাশ্য দরবারে মালোজীর ছেলের বাগদত্তা হয়েছে। কথাটা অবশ্য বেশি দিন চাপা থাকত না, প্রকাশ হয়ে পড়তই; কিন্তু এমনি তোমার ঠাকুর্দার উদ্যম আর তৎপরতা যে সপ্তাহ মধ্যে মহারাষ্ট্রের সর্বত্র এই সুসংবাদ প্রচার হয়ে পড়ল, জনপ্রাণীরও জানতে বাকি রইল না।

"লখুজী নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে লাগলেন। মালোজীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়ে গেল, এমন কি মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, মালোজীর মতো ধড়িবাজ অকৃতজ্ঞ লোককে আর তিনি কোন সাহায্য করবেন না, বরং তার যাতে অনিষ্ট হয় সেই চেষ্টাই করবেন।

"তাঁর প্রতিজ্ঞা কিন্তু রইল না। যতই বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল, ততই তিনি বুঝতে পারলেন চতুর মালোজী তাঁকে কি বিষম ফাঁদে ফেলেছে। তিনি বুঝলেন অন্যত্র মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ে সুখী হবে না, যত তার বয়স বাড়ছে শাহু ছাড়া আর কেউ যে তার স্বামী হতে পারে না, এ ধারণা তার মনে ততই দৃঢ় হচ্ছে। তাছাড়া অন্যের বাগদত্তা মেয়ে কেউ জেনে শুনে বিয়ে করতে চায় না, দু'চারটে ঘরানা ঘরে সম্বন্ধ করতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে লখুজীকে ফিরে আসতে হ'ল। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন শাহু ছাড়া জিজার গতি নেই।

"এই ভাবে ন'-দশ বছর কেটে গেছে। মালোজী কপালের জোরে এবং বুদ্ধিবলে খুব উন্নতি করেছেন, বিষয়-সম্পত্তিও হয়েছে। লখুজীর

বিদ্বেষ ও অনিচ্ছা ক্রমেই কমে আসতে লাগল। তারপর একদিন মালোজীকে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভাই, আমারই ভুল; জিজাকে তুমি তোমার ছেলের জন্যে নিয়ে যাও।'

"ব্যাস, আর কি! এইখানেই গল্প শেষ। মালোজীর মতলব সিদ্ধ হ'ল, মহা ধূমধাম করে তোমার বাপের সঙ্গে তোমার মায়ের বিয়ে হয়ে গেল। তখন তোমার মার বয়স তেরো বৎসর, আর শাহুর পনেরো। বিয়ের রাত্রে তোমার মার গর্বোজ্জ্বল হাসিভরা মুখ আমার আজও মনে আছে।

"তবে একথা ঠিক যে জন্মান্তরের সম্বন্ধ না হ'লে এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, এত বড় সামাজিক পার্থক্য লঙ্ঘন করে এ বিয়ে কখনই হতে পারত না। তোমার মা-বাবা পূর্বজন্মেও স্বামী-স্ত্রী ছিলেন।"

বৃদ্ধ দাদো মৌন হইলেন। কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না, দুইজনে নীরবে চলিলেন। অন্ধকার তখন বেশ গাঢ় হইয়াছে, পাশের লোকও স্পষ্ট দেখা যায় না। দাদো লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, বালক দুই কর যুক্ত করিয়া ললাটে ঠেকাইয়া বারংবার কাহারও উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছে। দাদো কথা কহিলেন না, অপূর্ব আবেগভরে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অর্ধস্ফুটস্বরে বালক বলিল, "কি সুন্দর গল্প! আমার মার মতো এমন মা পৃথিবীতে আর কারো নেই— না দাদো?"

দাদো সংযতকণ্ঠে বলিলেন, "না। তোমার মায়ের মতো এমন অসামান্যা নারী আর কোথাও নেই। সেই তিন বছর বয়স থেকে আজ পর্যন্ত দেখে আসছি, এমনটি আর দেখিনি।"

পূর্ণ হৃদয় লইয়া দুজনে নীরব রহিলেন। ক্রমে পুনার আলোক

নিকটবর্তী হইতে লাগিল, পথ সমতল ও অনুদ্ঘাত হইল। অশ্বদ্বয় আশু গৃহে পৌঁছিবার আশায় দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল।

পুনা পৌঁছিতে যখন পাদক্রোশ মাত্র বাকি আছে, তখন কে একজন সম্মুখে অন্ধকার হইতে উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল, "হো শিব্বা হো ! হো দাদোজী !"

বালক শিব্বা চমকিয়া উঠিয়া সানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "তানা ! তানা !" তারপর তীরবেগে সম্মুখে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

অন্ধকারে তানাজী মালেশ্বর ঘোড়ার উপর বসিয়া ছিল, শিব্বা প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল।

তানাজী তিরস্কারের সুরে বলিল, "আজ কি আর বাড়ি ফিরতে হবে না? কোথায় ছিলে এতক্ষণ? মা কত ভাবছেন, শেষে আর থাকতে না পেরে আমাকে পাঠালেন।"

শিব্বা ঘোড়ার উপর হইতেই তানাজীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা কোথায় রে, তানা?"

তানাজী বলিল, "কোথায় আবার—বাড়িতে! দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পথের পানে চেয়ে আছেন। তোমার এত দেরি হ'ল কেন?" গলা খাটো করিয়া বলিল, "দেওরামের সঙ্গে দেখা হ'ল নাকি? ওদিকের কি খবর? কবে?"

শিব্বা অন্যমনস্কভাবে বলিল, "খবর ভালো। অমাবস্যার রাত্রে সব ঠিক হয়েছে।—চল তানা, শীগ্‌গির বাড়ি যাই। মাকে সমস্ত দিন দেখিনি—ভারি মন-কেমন করছে।"

দুই কিশোর বন্ধু তখন নীড়-প্রতিগামী পাখীর মতো দ্রুতবেগে গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

বৃদ্ধ দাদোজী কোণ্ডু বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন।

রক্ত-খদ্যোত

সন্ধ্যার সময় প্রাত্যহিক অভ্যাসমত গুটিকয়েক সভ্য ক্লাবঘরের মধ্যে সমবেত হইয়াছিলাম।

বরদা সিগারেটের ক্ষুদ্র শেষাংশটুকুতে লম্বা একটা সুখটান দিয়া সেটা সযত্নে অ্যাশ-ট্রের উপর রাখিয়া দিল। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "ভূতের গল্প তোমরা অনেকেই শুনেছ, কিন্তু ভূতের মুখে ভূতের গল্প কেউ শুনেছ কি ?"

অমূল্য এক কোণে বসিয়া একখানি সচিত্র বিলাতি মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতেছিল। বলিল, "অসম্ভব একটা কিছু বরদার বলাই চাই।"

বরদা বলিল, "আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা অসম্ভব বলে মনে হ'তে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। তবে বলি শোন—"

অমূল্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, আজ যে আমাদের সাহিত্য-সভার অধিবেশন। অতুল, তোমার 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র' প্রবন্ধটা তাহ'লে—"

হৃষী বলিল, "কাল হবে। বস্তুতন্ত্রের চেয়ে বড় জিনিস আজ এসে পড়েছেন। বরদা, তোমার গল্প আরম্ভ হোক্।"

অমূল্য অস্থির হইয়া বলিল, "আজ তাহ'লে বরদার কতকগুলো মিথ্যে কথা শুনেই সন্ধ্যেবেলাটা কাটাতে হবে ?"

প্রশান্তকণ্ঠে বরদা বলিল, "কথাটা শুনে তারপর সত্যিমিথ্যে বিচার করা উচিত। তাহ'লে আরম্ভ করি। গত বৎসর—"

অমূল্যর নাসারন্ধ্র হইতে একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

বরদা বলিল, "গত বৎসর আমার প্ল্যাঞ্চেটে ভূত নামাবার সখ

হয়েছিল, বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। যারা জানে-শোনে, তাদের পক্ষে ভূত-নামানো অতি সহজ ব্যাপার। দরকারী আসবাবের মধ্যে কেবল একটি তেপায়া টেবিল।”

অমূল্য বিড় বিড় করিয়া বলিল, “আর একটি গুলিখোর।”

বরদা ওদিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, “একদিন একটা ছোট দেখে তেপায়া টেবিল যোগাড় করে সন্ধ্যের পর আমাদের তেতলার সেই নিরিবিলি ঘরটায় বসে গেলুম—আমি, আমার বউ, আর পেঁচো—”

অমূল্য বলিল, “এই বয়স থেকেই ছোট ভাইটির মাথা খাওয়া হচ্ছে কেন? বউয়ের কথা না হয় ছেড়ে দিই, কারণ যেদিন তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সেদিনই তার যা হবার হয়ে গেছে—”

বরদা বলিল, “পেঁচোকে নেবার কারণ, তিন জনের কমে চক্র হয় না। তাছাড়া সে ছেলেমানুষ, সুতরাং মিডিয়ম্ হবার উপযুক্ত। সে যাক্, মেঝের ওপর টেবিল ঘিরে তো বসা গেল—কিন্তু ভাবনা হ'ল কাকে ডাকি! ভূত তো আর একটি-আধটি নয়, পৃথিবীর আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত যত লোকের ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটেছে সকলের দাবি সমান। এখন কাকে ফেলে কাকে ডাকি?”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বরদা বলিল, “আমাদের সুভাষকে চেনো তো—জুনিয়র উকিল? তার ভগ্নীপতি সুরেশবাবু হাওয়া বদলাতে এসে গত শীতকালে নিউমোনিয়ায় মারা যান, বোধ হয় তোমাদের স্মরণ আছে।…অমূল্য, তুমি তো পোড়াতে গিছলে? হঠাৎ সেই সুরেশবাবুকে মনে পড়ে গেল। তখন তিনজনে আলোটা কমিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর আঙুলে আঙুল ঠেকিয়ে সুরেশবাবুর ধ্যান সুরু করে দিলুম। বেশিক্ষণ নয় ভাই, মিনিট-পাঁচেক চোখ বুজে থাকবার পর চোখ চেয়ে দেখি পাঁচুটা কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছে,—কশ বেয়ে নাল গড়াচ্ছে,

চোখ শিবনেত্র, বিজ বিজ করে কি বকছে! 'কি রে!'—বলে তাকে একটা ঠেলা দিলুম—কাৎ হয়ে পড়ে গেল! বউ তো 'বাবা গো! বলে আমাকে খুব ঠেসে জড়িয়ে ধরলে।"

হৃষী বলিল,"বস্তুতন্ত্র এসে পড়ছে। এবার আসল গল্পটা আরম্ভ হোক্।"

বরদা বলিল, "বুঝলুম ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। পেচোকে অনেক প্রশ্ন করলুম, কিন্তু সে জড়িয়ে জড়িয়ে কি যে উত্তর দিলে বোঝা গেল না। বড়ই মুস্কিল। তখন আমার মাথায় এক বুদ্ধি গজাল। কাগজ-পেনসিল এনে পেঁচোর হাতে ধরিয়ে দিলুম। পেনসিল হাতে পেয়ে পেঁচো সটান উঠে বসল। উঠে বসে লিখতে আরম্ভ করে দিলে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! পেঁচোর চোখ বন্ধ, মুখ দিয়ে লাল গড়াচ্ছে, আর প্রাণপণে কাগজের ওপর লিখে যাচ্ছে।"

পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া বরদা বলিল, "আবার হাতের লেখা দেখে অবাক হয়ে যাবে, দস্তুরমত পাকা হাতের লেখা। কে বলবে যে পেঁচো লিখেছে?"

অমূল্য লেখাটা তদারক করিয়া বলিল, "পেঁচো লিখেছে কেউ বলবে না বটে,কিন্তু তোমার লেখা বলে অনেকেরই সন্দেহ হ'তে পারে।"

বরদা বলিল, "এই লেখা হাতে পাবার পর আমি সুভাষের বাড়ি গিয়েছিলুম। সুরেশবাবুর পুরোনো একখানা চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলুম,—অবিকল তাঁর হাতের লেখা। বিশ্বাস না হয় তোমরা যাচিয়ে দেখতে পারো।"

অমূল্য বলিল, "অবশ্য দেখব।"

হৃষী বলিল, "সে যাক্। এখন তুমি কি বলতে চাও যে, ঐ কাগজের তাড়াটা সুরেশবাবুর প্রেতাত্মার জবানবন্দি?"

বরদা বলিল, "এটা হচ্ছে তাঁর মৃত্যুর ইতিহাস। পুরোপুরি সত্যি

কি না সে-কথা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু গোড়ার খানিকটা যে সত্যি তা সুভাষ সেদিন স্বীকার করেছিল।"

"এইবার তবে আসল গল্পটা শোন"—এই বলিয়া বরদা কাগজের তাড়াটা তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।—

*   *   *

যাঁহারা মুঙ্গের সহরের সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে উক্ত শহরে পিপর-পাঁতি নামক যে বিখ্যাত বীথিপথ আছে, তাহার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার কূলে মুসলমানদের একটি অতি প্রাচীন গোরস্থান আছে। বোধ করি এই গোরস্থানের সব গোরগুলিই শতাধিক বর্ষের পুরাতন। স্থানটি অনাদৃত। কাঁটাগাছ ও জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে অস্থিপঞ্জর প্রকট করিয়াই এই কবরগুলি কোনও রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

এই গোরস্থানের এক কোণে একটি কষ্টিপাথরের গোর আছে। এই গোরটি সম্বন্ধে সহরে অনেক ভূতুড়ে গল্প প্রচলিত ছিল। এই সব আজগুবি গল্প শুনিয়া আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালক বলিলেন যে, গোরটা সজীব। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে নাকি এক সাহেব ঐ গোর লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়াছিল। গুলির আঘাতে পাথর ফাটিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিয়াছিল। সে রক্তের দাগ এখনও মিলায় নাই, গোরের গায়ে তেমনি শুকাইয়া গড়াইয়া আছে। আর, যে নাস্তিক সাহেব গুলি করিয়াছিল সেও প্রাণে বাঁচে নাই, সেই রাত্রেই ভয়ংকর ভাবে তার মৃত্যু হইয়াছিল।

একদিন শীতের সন্ধ্যায় শ্যালককে সঙ্গে লইয়া গোরটি দেখিতে গেলাম। শ্যালক আমারই সমবয়সী, প্রেত-যোনিতে অটল বিশ্বাস। আমি কিছুদিন যাবৎ মুঙ্গেরে আসিয়া শ্যালক-মন্দিরেই বায়ুপরিবর্তন করিতেছিলাম। সঙ্গে স্ত্রী ছিলেন।

গোরস্থানের নিকটে গিয়া দেখিলাম স্থানটি কাঁটাগাছের বর্মে প্রায় দুর্ভেদ্য হইয়া আছে। অনেক যত্নে অনেক সাবধানে পা ফেলিয়া এবং কাপড়-চোপড় বাঁচাইয়া সেই ভূতুড়ে গোরটির সম্মুখীন হইলাম। কালো পাথরের গোর, আপাতদৃষ্টিতে ভৌতিকত্ব কিছুই চোখে পড়িল না।

হঠাৎ, যখন আমরা গোরটির একেবারে নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছি, তখন সেই কালো পাথরের উপর শায়িত আরও কালো একটা জন্তু বোধ হয় আমাদের পদশব্দে জাগিয়া উঠিয়া, একবার আমাদের মুখের উপর তাহার চক্ষু দুটো মেলিয়া ধরিয়া, আস্তে আস্তে গোরের অন্তরালে মিলাইয়া গেল।

দেখিলাম একটা কুকুর। রং কুচকুচে কালো, শরীর যে হিসাবে লম্বা সে হিসাবে উঁচু নয়—পা-গুলা বাঁকা বাঁকা এবং অত্যন্ত খর্ব; কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ তাহার চক্ষু দুটা—হল্‌দে রঙের সহিত ঈষৎ রক্তাভ এবং মণিহীন। পলক ফেলিলে মনে হয় যেন অন্ধকার রাত্রে খদ্যোত জ্বলিতেছে।

শ্যালক বলিলেন, "লোকে বলে ওই কুকুরটাই সাহেবের টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলেছিল।"

আমি বলিলাম, "পঞ্চাশ বছর আগে? কিন্তু কুকুরটাকে তো অত প্রাচীন বলে বোধ হ'ল না।"

আমরা কবরটার একেবারে পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম কুকুরটা যে-স্থানে শুইয়াছিল ঠিক সেই স্থানে পাথরের খানিকটা চটা উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহারই চারি পাশে লাল রঙের একটা পদার্থ শুকাইয়া আছে—হঠাৎ রক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। যেন ঐ কুকুরটা সমাধির রক্তাক্ত ক্ষতটাকে বুক দিয়া আগলাইয়া থাকে।

শ্যালক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম বোধ হচ্ছে?"

আমি বলিলাম, "আশ্চর্য বটে। আমার মনে হয় খুব গরম একটা ধাতু দিয়ে এই পাথরে আঘাত করা হয়েছিল, তাতেই এই রকম হয়েছে।"

আমার মন্তব্য শুনিয়া শ্যালক আধ্যাত্মিকভাবে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "তা হবে।" কিন্তু তাহা যে একেবারেই হইতে পারে না তাহা তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে বেশ বুঝা গেল।

কোনও একটা তর্কাধীন বিষয়ের আলোচনায় মানুষ যখন উচ্চ অঙ্গের হাসি হাসিয়া এমন ভাব দেখায় যেন অপর পক্ষের সঙ্গে তর্ক করাটাই ছেলেমানুষী, তখন অপর পক্ষের মনে রাগ-হওয়া স্বাভাবিক। আমারও একটু রাগ হইল; কিন্তু যে-লোক তর্ক করিতে অসম্মত, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। তাই আমি বলিলাম, "আচ্ছা এক কাজ করা যাক, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। এই পাথরটা ভেঙেই দেখা যাক না, ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরোয় কি না। প্রত্যক্ষের বড় তো আর প্রমাণ নেই—"

নিকটেই একখণ্ড পাথর পড়িয়া ছিল, আমি সেটা তুলিয়া লইয়া গোরে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় সেই কুকুরটা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া একটা বিশ্রী রকমের চিৎকার করিয়া উঠিল এবং সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া অত্যন্ত হিংস্রভাবে আমাকে শাসাইয়া দিল।

শ্যালক আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন, "চলে এসো, চলে এসো, কি যে তোমার পাগলামি—"

কুকুরটার আকস্মিক আবির্ভাবে আমার শ্যালক মহাশয় যতটা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাস্তবিকপক্ষে আমি ততটা হই নাই।

অথচ একটা হিংস্র কুকুরকে অযথা ঘাঁটানো বিশেষ যুক্তির কাজ নয়। তাই পরীক্ষা-কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া আমরা যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম

তখন তুমুল তর্ক বাধিয়া গিয়াছে; কুকুরের জীবনের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের শাণিত যুক্তিগুলি শ্যালকের কুসংস্কারের বর্মের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া ভগ্নোগুমে ফিরিয়া আসিতেছে।

বাড়ি ফিরিতেই আমার শালাজ এবং যাঁহার সম্পর্কে শালার সহিত সম্বন্ধ তিনি আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিলেন। দুজনেই নবীনা, বিদুষী—প্রতীচ্যের আলোক তাঁহাদের চোখে সোনার কাঠি স্পর্শ করাইয়াছে—তাঁহারা আসিয়াই আমার পক্ষে যোগদান করিলেন। শ্যালক বেচারির বর্ম তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল।

তর্কে যে ব্যক্তি হারে তাহার জিদ বাড়িয়া যায়। যুক্তির দিকে তখন আর তাহার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। শ্যালক শেষে চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মানতে না চাও, মেনো না; কিন্তু দুপুর রাত্রে একলা ঐ জায়গায় যেতে পারে এমন লোক তো কোথাও দেখি না।"

শালাজ উৎসাহদীপ্ত চক্ষে কহিলেন, "আচ্ছা, এমন লোক যদি পাওয়া যায় যে যেতে পারে, তাহ'লে তো মানবে যে তোমার ভূত শুধু তোমার ঘাড়েই ভর করে আছে—আর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই?"

শ্যালক গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, "একলা রাত্রে সেখানে যেতে পারে এত সাহস কারুর নেই; আর যদি বা কেউ যায়, সে যে ফিরে আসবে এমন কোনও সম্ভাবনা দেখি না।

আমি বলিলাম, "সকলের সাহস এবং সম্ভাবনা সমান নয়। আমি যেতে প্রস্তুত আছি।"

শ্যালক অতি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া বলিলেন, "তুমি—প্রস্তুত আছ? রাত বারোটার সময় একলা—"

তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "নিশ্চয়। খোট্টার দেশে বেশি দিন থাকিনি

বলেই বোধ হয় আমার সে সাহসটুকু আছে। তাহ'লে আজই ভালো। আজ বোধ হয় অমাবস্যা। শাস্ত্র অনুসারে রাজ্যের ভূতপ্রেত দৈত্যদানা আজ সবাই এই মর্ত্যভূমিতে ফিরে এসে দিগ্বিদিকে নৃত্য করে বেড়াবেন। অতএব এ সুযোগ ছাড়া অনুচিত।"

শ্যালক ভীত চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, "গোঁয়াতুর্মি ক'রো না সুরেশ, ভারি খারাপ জায়গা। এ সব বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা নেই—"

তীব্র হাস্যোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শালাজের নিকট হইতে প্রতিবাদ আসিল, "ভয় পাবেন না সুরেশবাবু, আপনার জন্যে একটা খুব ভালো প্রাইজ ঠিক করে রাখলুম। আপনি জয় করে ফিরে এলেই এ-বাড়ির কোনও এক মহিলা তাঁর বিম্বাধরের রক্তিমরাগে আপনার কপালে ললাটিকা পরিয়ে দেবেন। ভূতজয়ী বীরের সেই হবে রাজটীকা।"

আমি উৎসাহ দেখাইয়া বলিলাম, "লোভ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মহিলাটি কে শুনি ?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তাঁর সঙ্গে কারুর তুলনাই হয় না।"—বলিয়া আমার গৃহিণীর দিকে কটাক্ষপাত করিলেন।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "ঐ জাতীয় প্রাইজ যদিও আমার ভাগ্যে খুব দুর্লভ নয় (গৃহিণী জনান্তিকে,—'আঃ—কি বকছ—দাদা রয়েছেন !'), তবু অধিকের প্রতি আমার বিরাগ নেই। তাহ'লে চুক্তি পাকা হয়ে গেল—আজ রাত্রেই যাব ; কিন্তু আমি যে সত্যি সত্যিই কবরের কাছে গিয়েছি, এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে আসিনি, এ কথা শেষকালে আপনাদের বিশ্বাস হবে তো ?"

শালাজ অতি দূরদর্শিনী, বলিলেন, "আপনার মুখের কথা আমরা বিশ্বাস করব নিশ্চয়, কিন্তু যাঁকে বিশ্বাস করানো দরকার তিনিই হয়তো

করবেন না। অতএব আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। খড়ি দিয়ে গোরের ওপর নিজের নাম লিখে আসতে হবে।"

"তথাস্তু!" গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলাম, তোমার দাদার প্রেততত্ত্বের মাথায় বজ্রাঘাত করে দিয়ে আসা যাক্—কি বলো?"

অল্প দ্বিধাজড়িত হাসি ভিন্ন আর কোন জবাব পাওয়া গেল না।

শ্যালক বলিলেন, "ফাজলামি ছাড়ো। আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।"

শ্যালকের কথা শুনিলাম না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যত সহজ, পশ্চাৎপদ হওয়া তত সহজ নয়।

রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় গরম জামায় আপাদমস্তক আবৃত করিয়া একটা কড়া গোছের বর্মা চুরুট ধরাইয়া বাহির হইলাম। এতক্ষণে গৃহিণীর মুখ ফুটিল। প্রতীচ্য বিদ্যায় জলাঞ্জলি দিয়া বলিলেন, "থাক্, গিয়ে কাজ নেই।"

আমি হাসিয়া উঠিলাম, "পাগল! ভাই-বোন দু'জনকার ধাত একই রকম দেখছি।"

শ্যালক নিরতিশয় ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "তুমি এমন একগুঁয়ে জানলে কোন্ শালা তর্ক করত!"

এমন বিশ্রী অন্ধকার বোধ করি আর কখনও ভোগ করি নাই। একটা গুরুভার পদার্থের মতো অন্ধকার যেন চারিদিকে চাপিয়া বসিয়া আছে। পথ চলিতে চলিতে পদে পদে মনে হয় বুঝি পরমুহূর্তেই এক চাপ অন্ধকারে ঠোকর লাগিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইব।

চুরুটে লম্বা লম্বা টান মারিয়া মনে প্রফুল্লতা ও উৎসাহ সঞ্চয় করিতে

লাগিলাম। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অজ্ঞাতসারে এমন সতর্ক ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল যে, নিজের পদধ্বনি শুনিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিলাম, মনে হইল কে যেন চুপি চুপি পিছন হইতে আমার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু তথাপি অকারণে ভয় পাইবার পাত্র আমি নই। মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম, দ্বিপ্রহর রাত্রির এই অন্ধকার, এই স্তব্ধতা, এই বিজনতা সকলে মিলিয়া আমার আন্তরিক সাহসকে দুশ্ছেদ্য একটা ষড়যন্ত্রের জালে ধীরে ধীরে জড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। একটা অলৌকিক মায়া যেন আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। মাকড়সা যেমন শিকারকে প্রথমে সূক্ষ্ম তন্তুর সহস্র পাকে জড়াইয়া পরে ধীরে ধীরে জীর্ণ করিয়া ফেলে, তেমনি এই অদৃশ্য শক্তি আমার সহজ সত্তাকে ক্রমে ক্রমে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

ক্রমে পিপর-পাঁতি রাস্তার পূর্বপ্রান্তে আসিয়া পড়িলাম। ইহারই অপর প্রান্তে কবরস্থান। রাস্তার দুই পাশে বড় বড় গাছ, মাথার উপর বহু ঊর্ধ্বে তাহাদের শাখাপ্রশাখা মিলিয়াছে। অন্ধকার আরও জমাট বাঁধিয়া আসিল।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের মতো একটা স্পর্শ পাইলাম। শরীরের সমস্ত রোম শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। পরক্ষণেই একটা খুব লঘু পদার্থ পিঠের উপর দিয়া খড়্ খড়্ শব্দে নিচে গড়াইয়া পড়িল। বুঝিলাম, ভয় পাইবার মতো কিছু নয়, মাথার উপর যে-ঘনপল্লব শাখাগুলি আলিঙ্গনকে নিবিড় বিচ্ছেদবিহীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই একটি শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে। আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিতে লাগিলাম।

লম্বা টানের চোটে চুরুটটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অন্য সময়ে হইলে ফেলিয়া দিতাম, কিন্তু আজ সেটাকে কিছুতেই ছাড়িতে

পারিলাম না। তাহার অগ্নিদীপ্ত প্রান্তটুকুতে যেন একটু প্রাণের সংস্রব ছিল। এই নিঃসঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যখন সঙ্গীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, তখন ওই ক্ষীণ রশ্মিটুকুই জীবন্ত সঙ্গীর মতো প্রাণের মধ্যে ভরসা জাগাইয়া রাখিয়াছিল। ওটাকে ফেলিয়া দিলে যে অনেকখানি সাহসও চলিয়া যাইবে তাহা বেশ বুঝিতেছিলাম।

কিন্তু ক্রমে যখন আঙুল পুড়িতে লাগিল তখন সেটাকে ফেলিয়া দিতেই হইল। একবার বেশ ভালো করিয়া টানিয়া লইয়া সম্মুখের দিকে কিছু দূরে ফেলিয়া দিলাম।

ফেলিয়া দিবা মাত্র মনে হইল, যে-আঙুল দুটা দিয়া চুরুট ধরিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কোনও ছিদ্র পাইয়া খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আমার দৃষ্টি ছিল নিক্ষিপ্ত চুরুটটার উপর—সেটা মাটিতে পড়িবামাত্র আগুন ছিটকাইয়া উঠিল। তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। ছিটকানো আগুনটা মধ্যপথে দুটা আকৃতি ধরিয়া পাশাপাশি একসঙ্গে নড়িতে আরম্ভ করিল। মাটি হইতে প্রায় এক হাত উপরে থাকিয়া পরস্পরের চারি আঙুল ব্যবধানে এই ক্ষুদ্র অগ্নিগোলক দুটা একজোড়া লাল জোনাকির মতো সম্মুখ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং মাঝে মাঝে মিটমিট করিতে লাগিল।

আমার মাথা বোধ হয় গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কি জানি কেন, আমার ধারণা জন্মিল যে, ওই মিট্‌মিট্‌ করা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দুটা আর কিছুই নয়, দুটা চক্ষু আমার পানে তাকাইয়া আছে, এবং এই চক্ষু দুটার পশ্চাতে একটা খর্বাকৃতি কুকুরের কালো রং যে অন্ধকারে মিশাইয়া আছে, তাহা যেন মনে স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

চলিতে চলিতে কখন দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলাম লক্ষ্য করি নাই, চক্ষু দুটাও সম্মুখে কিছু দূরে দাঁড়াইল। তারপর কতক্ষণ যে নিষ্পলকভাবে

আমার মুখের দিকে দৃষ্টি ব্যাদান করিয়া রহিল জানি না, মনে হইল বহুক্ষণ পরে সেই চক্ষুর পলক পড়িল। তখন সেটা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দেহের উপর তখন কোনও অধিকারই নাই। স্বপ্নে বিভীষিকার সম্মুখ হইতে পলাইবার ক্ষমতা যেমন লুপ্ত হইয়া যায়, আমিও তেমনি নিতান্ত নিরুপায়ভাবে ওই চক্ষুর পশ্চাদ্বর্তী হইলাম। স্বাধীন ইচ্ছা তখন একেবারে জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, আছে কেবল সমস্ত চেতনাব্যাপী দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ভয়।

কতক্ষণ এই অগ্নিচক্ষুষ্মান আমাকে তাহার আকর্ষণ প্রভাবে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল আমার ধারণা নাই। একবার চেতনার অন্তরতম প্রদেশে যেন ক্ষীণ অনুভূতির ছায়া পড়িয়াছিল যে পাকা রাজপথ দিয়া চলিতেছি না; আর একবার মনে হইয়াছিল বুঝি একটা গাছের মোটা শিকড়ে ঠোক্কর খাইলাম; কিন্তু সে-সব আমার ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির বাহিরে।

হঠাৎ একটা বড় রকমের ঠোক্কর খাইলাম। এটা বেশ স্মরণ আছে। তারপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াই নিচের দিকে গড়াইতে সুরু করিলাম। কোথায় পড়িতেছি কোনও ধারণাই ছিল না; অন্ধকারে দেখাও অসম্ভব; কিন্তু এই পতন যে অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে এবং পতনের লক্ষ্যও যে একটা অতলস্পর্শ স্থানে লুকাইয়া আছে তাহা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অথচ কি নিদারুণ সেই পতন! গড়াইতে গড়াইতে এক ধাপ হইতে অন্য ধাপে পড়িতেছিলাম এবং প্রত্যেক স্তরে অবরোহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহের অস্থিগুলা যেন একবার করিয়া ভাঙিয়া যাইতেছিল।

এই অবরোহণের শেষ ধাপে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন জ্ঞান বিশেষ ছিল না, কিন্তু একটা অনন্ত যন্ত্রণার পথ যে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা সমস্ত শরীর দিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মেলিলাম। সেই দেহহীন লাল চক্ষু দুটা আমার

মুখের অত্যন্ত নিকটেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন নিরীক্ষণ করিতেছে; দেহের রক্ত তো জল হইয়া গিয়াছিলই, এবার তাহা একেবারে বরফ হইয়া গেল। একটা অসহ্য শীতের শিহরণ সমস্ত দেহটাকে যেন ঝাঁকানি দিয়া গেল। তারপর আর কিছু মনে নাই।

সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে জ্ঞান হইল। কল্যকার রাত্রি যে স্বাভাবিকভাবে কাটে নাই এই চিন্তা লইয়া চক্ষু মেলিলাম। ঘাসের উপর শুইয়া আছি দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে গেলাম—উঃ! গায়ে দারুণ বেদনা। আবার শুইয়া পড়িলাম। তখন ক্রমশঃ সব মনে পড়িল। ঘাড় না নাড়িয়া যতদূর সাধ্য দেখিয়া বুঝিলাম, 'পিপর-পাঁতি' রাস্তার পাশে পাশে কেল্লার যে শুষ্ক গড়খাই গিয়াছে, তাহারই তলদেশে বাবলা গাছের ঝোপের মধ্যে পড়িয়া আছি।

সূর্য উঠিল। এখানে সমস্ত দিন পড়িয়া থাকিলেও কেহ সন্ধান পাইবে না ইহা স্থির। শরীরে তো নড়িবার শক্তি নাই। প্রচণ্ড এক হেঁচকা মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম; চক্ষু হইতে আরম্ভ করিয়া দেহের সমস্ত রোম বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল; কিন্তু বাড়ি গিয়া পৌঁছিতেই হইবে। অসীম বলে মৃতপ্রায় দেহটাকে টানিতে টানিতে কি করিয়া বাড়িতে পৌঁছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার আমার সাধ্য নাই। বাড়ি যাইতেই সকলে চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল এবং উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে আমার ক্ষীণ চেতনা আবার লুপ্ত করিয়া দিবার যোগাড় করিল। শ্যালক সকলকে সরাইয়া দিয়া আমাকে একটা ইজিচেয়ারে বসাইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারা রাত কোথায় ছিলে? আমরা সকলে তোমার জন্যে—"

উত্তর দিতে গেলাম, কিন্তু কি ভয়ানক! গলার স্বর একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া একটা কথাও উচ্চারণ করিতে

পারিলাম না। শ্যালক আমাকে দুধ ও ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন।

ডাক্তার যখন আসিলেন, তখন বিছানায় শুইয়া আছি—ভয়ানক কম্প দিয়া জ্বর আসিতেছে। স্ত্রী ও শ্যালক মলিন মুখে মাথার শিয়রে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "দুটো লাংসই অ্যাফেক্ট্‌ করেছে—নিউমোনিয়া।"

তারপর আবার অচেতন হইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙিয়া দেখি শরীর বেশ ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে—কোথাও কোনও গ্লানি নাই।

কে একজন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন বোধ হচ্ছে?"

ফিরিয়া দেখি বিনোদ,—আমার ছেলেবেলার স্কুলের বন্ধু। অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। বলিলাম, "বেশ ভালোই বোধ হচ্ছে, ভাই। বুকের ওপর যে একটা ভার চাপানো ছিল সেটা আর টের পাচ্ছি না।"

বিনোদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "প্রথমটা ঐ রকম বোধ হয় বটে। আমার যখন কলেরা হয়—"

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—তাই তো! বিনোদ তো আজ দশ বৎসর হইল কলেরায় মরিয়াছে; আমি স্বহস্তে তাহাকে দাহ করিয়াছি। তবে সে এখানে আসিল কি করিয়া! মহাবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিনোদ, তুমি তো বেঁচে নেই—তুমি তো অনেক দিন মারা গেছ!"

বিনোদ আসিয়া আমার দুই হাত ধরিল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "তুমিও আর বেঁচে নেই, বন্ধু!"

কর্তার কীর্তি

বর্ধমান জেলার ধনী ও বনিয়াদি জমিদার বাবু হৃষীকেশ রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমন্তকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কারণ, সে তাঁহার মনোনীতা পাত্রীকে উপেক্ষা করিয়া একটি আই-এ পাস করা মেয়েকে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছিল।

ভয় নাই, ইহা পিতৃরোষপীড়িত হেমন্তের দুর্দশার করুণ কাহিনী নয়। হেমন্তকে শেষ পর্যন্ত অর্থাভাবে স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসাইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই। বিবাহের পূর্বেই সে কলিকাতার একটা বড় কলেজে অধ্যাপনার কাজ পাইয়াছিল; তাহা ছাড়া পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া ও ঘরে বসিয়া শিক্ষকতা করিয়াও যথেষ্ট উপার্জন করিত। সুতরাং পিতা ত্যাজ্যপুত্র করিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেও, অর্থের দিক দিয়া অন্ততঃ তাহার কোন ক্লেশ হয় নাই।

হৃষীকেশ বাবুর মতো বদরাগী অগ্নিশর্মা লোক আজকালকার দিনে বড়-একটা দেখা যায় না। পুরাকালে বদ্-মেজাজি বলিয়া দুর্বাসা মুনির একটা অপবাদ ছিল বটে, কিন্তু তিনিও অকারণে কাহাকেও অভিসম্পাত দিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। হৃষীকেশবাবুর কারণ-অকারণের বালাই ছিল না, তিনি সর্বদাই চটিয়া থাকিতেন। শুনা যায়, সতের বৎসর বয়সে তাঁহার একবার টাইফয়েড হয়, সারিয়া উঠিয়া তিনি তেঁতুলের অম্বল দিয়া ভাত খাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ডাক্তারের আদেশে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, ফলে সেই যে তিনি চটিয়া গিয়াছিলেন সে রাগ তাঁহার এখনও পড়ে নাই। একাদিক্রমে এত বৎসর রাগিয়া থাকার ফলে তাঁহার গোঁপ সমস্ত পাকিয়া গিয়াছিল এবং মাথার

সম্মুখ দিকে চুল উঠিয়া পরিষ্কার ও চিক্কণ হইয়া গিয়াছিল। চক্ষু দুটি সর্বদাই কষায়িত হইয়া থাকিত।

রাগের মাত্রা বাড়িয়া গেলে তিনি ঘরের আসবাব-পত্র ভাঙিতে আরম্ভ করিতেন। বাড়ির ভঙ্গপ্রবণ জিনিসগুলি প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, এমন সময় একদিন দৈবক্রমে হাতের কাছে একটা কাচের গ্লাস পাইয়া প্রথমেই সেটা ভাঙিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ইন্দ্রজালের মতো কাজ হইল। কাচ-ভাঙার শব্দে কর্তার অর্ধেক রাগ পড়িয়া গেল— সেদিন আর তিনি অন্য কিছু ভাঙিলেন না। অতঃপর তাঁহার রাগের মাত্রা চড়িয়া গেলেই বাড়ির যে-কেহ একটা কাচের গেলাস তাঁহার হাতে ধরাইয়া দিয়া সবেগে প্রস্থান করিত। তিনি সেটা মেঝেয় আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিতেন। এই অভিনব উপায়ে বাড়ির টেবিল, চেয়ার, আয়না, ঝাড় ইত্যাদি দামি আসবাব অনেকগুলি রক্ষা পাইয়াছিল।

দুই মাস অন্তর কলিকাতা হইতে এক গ্রোস করিয়া নূতন কাচের গেলাস আনানো হইত। তাহাতেই কোন রকমে কাজ চলিয়া যাইত।

রাগ যখন কম থাকিত, তখন তিনি তাঁহার খাসবেয়ারা গয়ারামকে 'শূয়ারকা বাচ্চা' না বলিয়া স্রেফ্ 'হারামজাদা' বলিয়া ডাকিতেন। তখন বাহিরের গোমস্তা হইতে ভিতরে গৃহিণী পর্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেন।

দুই বৎসর পূর্বে হেমন্ত যখন জানাইল যে, সে পিতৃনির্বাচিতা কলাবতী নাম্নী একাদশবর্ষীয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিবে না, পরন্তু বেথুন কলেজের একটি অষ্টাদশী মাতৃহীনা কুমারীকে বধূরূপে মনোনীত করিয়াছে তখন কর্তা দ্রুতপরম্পরায় তেইশটা গেলাস ভাঙিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তাহাতেও যখন ক্রোধ প্রশমিত হইল না, তখন তিনি হেমন্তের ঘরে ঢুকিয়া একখানা ছয় ফুট লম্বা ভিনীসিয় আয়না পদাঘাতে ভাঙিয়া ফেলিয়া দ্বারের

দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশপূর্বক ঘোর গর্জনে কহিলেন, "বেরিয়ে যা এখনি আমার বাড়ি থেকে, এক কাপড়ে বেরিয়ে যা। তোর মতো শূয়ারের মুখ দেখতে চাই না।"—বলিয়া হ্রেষাধ্বনির মতো একটা শব্দ করিলেন।

হেমন্ত সেই যে এক কাপড়ে বাহির হইয়া গেল, তাহার পর আজ পর্যন্ত পিতৃভবনে পদার্পণ করে নাই।

হেমন্তর বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়াই ছিল,—তাহার মাসীর বাড়ি হইতে বিবাহ হইবে। বিবাহের দিন-দুই পূর্বে গৃহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে কর্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি কালীঘাট যাব—মানত আছে। শিশিরের সঙ্গে আমায় পাঠিয়ে দাও।"

রাগী হইলেও হৃষীকেশবাবু অত্যন্ত কূটবুদ্ধি; গৃহিণীর আর্জি শুনিয়া তিনি হ্রেষাধ্বনিবৎ শব্দ করিলেন, কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "মানত আছে, শিশিরের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও! চালাকি! আচ্ছা আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। দেখি কেমন কালীঘাটের মানত!—গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল?"

গৃহিণী চক্ষে অঞ্চল দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। গয়া দ্বারের বাহিরে এক গেলাস সরবৎ হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঘরে ঢুকিয়া কর্তার হাতে দিতেই তিনি সেটা দেয়ালে মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেন, স-গর্জনে বলিলেন, "ম্যানেজারকে ডাক্।"

ম্যানেজার আসিলে তাহাকে হুকুম দিলেন, "খিড়কি আর সদর দেউড়িতে চারটে করে ষোট্টা দারোয়ান বসাও। বুড়ী না পালায়!—আর গয়া হারামজাদা তামাক দিয়ে যাক।"

হারামজাদা শুনিয়া সকলে বুঝিল গৃহিণীর চক্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়া কর্তা মনে মনে খুশী হইয়া উঠিয়াছেন।

গৃহিণীর কালীঘাটে পূজা দিতে যাওয়া হইল না। ওদিকে হেমন্তর বিবাহ হইয়া গেল।

ইহার পর ছুই বৎসর কাটিয়াছে। গৃহিণী বাড়ির মধ্যে কর্তার নজর-বন্দি আছেন, একদিনের জন্যও কোথাও যাইতে পান নাই। এমন কি ভগ্নীপতির অতবড় অসুখেও তাঁহাকে বোনের বাড়ি যাইতে দেওয়া হয় নাই; কিন্তু শিশিরকে বাড়ির মধ্যে অন্তরীণ রাখা শক্ত। সে কলেজে পড়ে, তাই বাধ্য হইয়া তাহাকে কলিকাতায় মাসীর বাড়ি থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। যা হোক্, হৃষীকেশবাবু তাহাকে ডাকিয়া শাসাইয়া দিয়াছেন যে কোনদিন যদি সে হেমন্তর বাড়িতে যায় কিংবা তাহার সহিত বাক্যালাপ করে তাহা হইলে তাহাকেও তিনি ত্যাজ্যপুত্র করিয়া বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিবেন।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েকদিন হইতে বাড়ির মধ্যে ভিতরে ভিতরে কি-একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কর্তা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। গত শনিবার শিশির আসিয়াছিল, সে মার কানে ফুস্‌ফুস্ করিয়া কি বলিয়া গেল, সেই অবধি গৃহিণী অতিশয় চঞ্চল ও বিমনা হইয়া বেড়াইতেছেন। গৃহকর্মে তাঁহার মন নাই; একদিন ক্রন্দনরত অবস্থায় কর্তার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন; কিন্তু বহু উৎপীড়ন ও তর্জন করিয়াও কর্তা ভিতরের কথা কিছুই বাহির করিতে পারেন নাই। তাঁহার সকল প্রশ্নই গৃহিণী উদাস মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া সহ্য করিয়াছেন। তাহাতে আর কিছু না হোক্, বাড়িতে কাচের গেলাসের সংখ্যা ভয়ানক দ্রুত কমিয়া আসিতেছে।

একে তো এইরূপ অবস্থা, তাহার উপর আজ সকালে উঠিয়াই কর্তা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া গিয়াছেন। হতভাগ্য সরকার সকালবেলা হুকুম লইতে আসিয়া কর্তার সম্মুখেই হাঁচিয়া ফেলিয়াছিল। আর যায়

কোথা? কর্তা একেবারে হুংকার দিয়া উঠিলেন, "বেয়াদব, উল্লুক কোথাকার! এত বড় আস্পর্ধা! গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল?"

সরকার তো প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু কর্তার সে রাগ সমস্ত দিনে পড়িল না। আজ কিনা সন্ধ্যার সময় আবার শিশির আসিল! নিজের বসিবার ঘর হইতে তাহার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া কর্তা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিশির ঘরে ঢুকিতেই তিনি আরম্ভ করিলেন, "তুই হেমন্তর বাড়িতে যাস্? সত্যি কথা বল্ হতভাগা, নইলে আজ তোকে মেরেই খুন করব।"

কুড়ি বছরের ছেলে শিশির পিতার মুখের পানে হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া রহিল, তাঁহার প্রশ্নের হাঁ-না কোন উত্তরই দিতে পারিল না।

হৃষীকেশবাবু তাঁহার কণ্ঠস্বর তারা গ্রামের ধৈবতে তুলিয়া বলিলেন, "কার হুকুমে তুই সেখানে গিয়েছিলি রে পাজি, নচ্ছার! কি বলেছিলাম তোকে আমি! আমার হুকুম হুকুম নয়, বটে?"

শিশির গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হৃষীকেশবাবু এক পদাঘাতে জ্বলন্ত কলিকাশুদ্ধ গড়গড়াটা দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "কি করতে তুই গিয়েছিলি সেখানে, বল্ আমাকে! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! নিজের মার কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে কি বলেছিস্? বল্ শীগ্‌গির হতভাগা, নইলে গাছে বেঁধে তোর গায়ে জলবিছুটি দেওয়াব।"

শিশির ভিতরে ভিতরে মরিয়া হইয়া উঠিল। সে দু-হাত শক্তভাবে মুঠি করিয়া বলিল, "আমি এখন থেকে দাদা-বৌদির কাছেই থাকব ঠিক করেছি। আর—আর মাকেও তাঁদের কাছে নিয়ে যাব।"

হৃষীকেশবাবু একেবারে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, "কী, এতবড় আস্পর্ধা!"

শিশির গোঁ-ভরে বলিয়া চলিল, "আমাকে থাকতেই হবে,—বৌদির শরীর খারাপ, তাঁর—তাঁর—ছেলে হবে—"

হৃষীকেশ আবার চিৎকার করিবার জন্য হাঁ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন। সংবাদটা পরিপাক করিতে মিনিট-খানেক সময় লাগিল, তারপর পুনশ্চ গর্জন ছাড়িলেন, "ছেলে হবে তো তোর কিরে শূয়ার ?"

শিশির বলিল, "দাদা সমস্ত দিন বাড়ি থাকেন না, বৌদি একলা, তাই আমাকে থাকতে হবে। আর মাকেও—"

"বেরোও! বেরোও! এই দণ্ডে আমার বাড়ি থেকে দূর হ—নইলে গ্রাব্‌কে লাল করে দেব। শূয়ার, পাজি, বোম্বেটে কোথাকার! যাবিনে ? গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল, নিয়ে আয় আমার হাণ্টার—"

শিশির আর অপেক্ষা করিল না, যেমন আসিয়াছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল। মার সহিত সাক্ষাৎ পর্যন্ত করা হইল না।

সমস্ত রাত্রি হৃষীকেশ বাড়িময় দাপাইয়া বেড়াইলেন। সেদিন আর ভয়ে কেহ তাঁহার কাছে গেলাস লইয়াও অগ্রসর হইতে পারিল না।

পরদিন বেলা নয়টার সময় স্নানাহার করিয়া তিনি ম্যানেজারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, "আমি কলকাতায় যাচ্ছি, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরব। তুমি সাবধানে থেকো—গিন্নী না পালায়। আর শিশির লক্ষ্মী-ছাড়া যদি বাড়ি ঢুকতে চায়, মেরে তাড়াবে।—গাড়ি যুততে বলো।"

ম্যানেজার ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "মোটর-কোম্পানির এজেণ্টকে আজ ডেকেছিলেন, সে এসেছে। তাকে—"

হৃষীকেশবাবু বলিলেন, "তাকে চুলোয় যেতে বলো। আমি কলকাতায় যাচ্ছি, নিজে দেখে মোটর কিনব। গাড়ি যুততে বলো।"—বলিয়া চেক বহিখানা পকেটে পুরিলেন।

"ম্যানেজার "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

গাড়ীতে স্টেশনে যাইতে যাইতে হৃষীকেশ নিজের মনে গর্জিতে লাগিলেন, "কি আস্পর্ধা! আমার সঙ্গে চালাকি! দেখে নেব। আমার বৌ—আমার নাতি! আমি হৃষীকেশ রায়—দেখে নেব কে কি করতে পারে।"

বেলা প্রায় দেড়টার সময় একখানা ঝকঝকে নূতন মোটর গাড়ি কলিকাতায় প্রোফেসার হেমন্ত রায়ের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ির আরোহী গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ছোট্ট সুদৃশ্য বাড়িখানি, চারি ধারে একটুখানি সংকীর্ণ ঘাসের বেষ্টনী; সামনে লোহার ফটক বন্ধ।

হ্রেষাধ্বনি করিয়া হৃষীকেশবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন। ফটক খুলিয়া সম্মুখের বন্ধ দরজায় সজোরে কড়া নাড়িলেন। একটা ছোকরা গোছের চাকর দ্বার খুলিয়া সম্মুখে কষায়িত-নেত্র বৃদ্ধ ও তাঁহার পিছনে একখানি দামি নূতন মোটরকার দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই বাবু?"

হৃষীকেশবাবু উত্তর না দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চাকরটা বলিল, "বাবু বাড়ি নেই, কলেজে গেছেন। তাঁর ফিরতে দেরি আছে।"

হৃষীকেশ কর্ণপাত না করিয়া ভিতরের দিকে চলিলেন। চাকরটা এই অদ্ভুত বৃদ্ধের আচরণ দেখিয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের পথ আগলাইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, "ওদিকে কোথায় চলেছেন! ওটা অন্দরমহল। বাবু বাড়ি নেই, এসময় আপনি কি চান? আপনার নাম কি?"

হৃষীকেশ শুধু একটি হ্রেষাধ্বনি করিয়া চাকরটার কর্ণধারণপূর্বক এক ধারে সরাইয়া দিলেন। তারপর সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া গট্ গট্ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

উপরের একটা ঘরে তখন মেঝের উপর মাদুর বিছাইয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া প্রতিমা ভেল্‌ভেটের জুতার কাপড়ে রেশমের ফুল তুলিতেছিল। কৃশাঙ্গী সুন্দরী, বুদ্ধির বিভায় মুখখানি জ্বলজ্বল, চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো, নূতন সৌভাগ্যের কোন লক্ষণই এখনও দেহে প্রকাশ পায় নাই; তাহাকে দেখিলেই মন খুশী হইয়া উঠে। তাহার হাঁটুর কাছে মাথা রাখিয়া শিশির কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া লম্বা ভাবে শুইয়া ছিল। গতকল্য বাবার সহিত যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহা বৌদিদিকে বলা যাইতে পারে কিনা, সে মনে মনে তাহাই গবেষণা করিতেছিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল—না, বলিয়া কাজ নাই। বৌদিদি দুঃখ পাইবেন মাত্র, আর কোন ফল হইবে না। দাদাকে চুপি চুপি এক সময় বলিলেই হইবে।

বৌদিদির সন্তান-সম্ভাবনার কথা গত সপ্তাহে দাদার মুখে শুনিয়া শিশির আপনা হইতে ছুটিয়া মার কাছে গিয়াছিল। মাও শুনিয়া আনন্দে ও আশঙ্কায় অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু কর্তার রোষ-বহ্নি ডিঙাইয়া কিছু করিতে সাহস করেন নাই। গতকল্য শিশির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আবার বাড়ি গিয়াছিল—যেমন করিয়াই হউক মাকে লইয়া আসিবে। তারপরেই সেই বিভ্রাট! মার সঙ্গে শিশির দেখা পর্যন্ত করিতে পাইল না।

এই কথাটাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে শিশির বলিল, "আচ্ছা বৌদি, মা যদি এখন কোন রকমে হঠাৎ এসে পড়েন?"

সম্মুখের দেয়ালে শ্বশুর ও শাশুড়ীর এন্‌লার্জ্‌ করা ফটোগ্রাফ টাঙানো

ছিল। সেই দিকে চোখ তুলিয়া কিছুক্ষণ শাশুড়ীর ছবির দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতিমা বলিল, "তা যদি হ'ত, ঠাকুরপো—"

শিশির সহসা কনুইয়ে ভর দিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, মাকে যদি চুরি করে নিয়ে আসি—বাবা কিছু টের না পান ?"

জিভ কাটিয়া প্রতিমা বলিল, "বাপ রে! তাহ'লে কি আর রক্ষে থাকবে ? বাবা তাহ'লে কাউকে আস্ত রাখবেন না।"

বস্তুতঃ, চোখে না দেখিলেও শ্বশুরের মেজাজ সম্বন্ধে কোন কথাই প্রতিমার অজ্ঞাত ছিল না। তাহাকে বিবাহ করার ফলেই যে স্বামীর সহিত শ্বশুরের এমন বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল তাহা সে বিবাহের সময় হইতেই জানে। হেমন্ত অবশ্য কোনদিন এ সম্বন্ধে তাহাকে কোন কথা বলে নাই, কিন্তু শ্বশুরঘরের জন্য সর্বদাই প্রতিমার প্রাণ কাঁদিতে থাকিত। রাগী হউন, কিন্তু শ্বশুর যে কখনই মন্দ লোক নহেন ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরে বঞ্চিত হইয়া এই মেয়েটি যে মনের মধ্যে কতখানি বেদনা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা তাহার স্বামীও কোনদিন জানিতে পারে নাই। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বলিয়া সে ও-ভাব কখনও ইঙ্গিতেও প্রকাশ করে নাই, পাছে স্বামী উদ্বিগ্ন হন।

শিশির আবার কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া শুইয়াছিল, প্রতিমা ছলছল চক্ষে বলিল, "আমার ভাগ্যে সে কি আর হবে, ঠাকুরপো ? বাবা-মাকে আমি এজন্মে চোখে দেখতে পাব না।"—বলিয়া একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

এমন সময় নিচে হ্রেষাধ্বনির মতো শব্দ শুনিয়া শিশির তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। এ শব্দ তো ভুল হইবার নয়! সে প্রতিমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "বাবা! বাবা এসেছেন!"—বলিয়াই

এক লাফে পাশের ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

প্রতিমার মুখ সাদা হইয়া গেল, বুক ঢিবঢিব করিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় আঁচল টানিয়া দিতেই হৃষীকেশবাবু ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আমার নাম শ্রীহৃষীকেশ রায়। আমি বর্ধমান থেকে আসছি।"—বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন।

এইখানে প্রতিমা একটু অভিনয় করিল। মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা জোর করিয়া চাপিয়া সে সচকিতে ফিরিয়া মুখের ঘোমটা সরাইয়া দিল। বিস্ময়-আনন্দ-ভক্তি-লজ্জা-মিশ্রিত চক্ষে হৃষীকেশবাবুর মুখের দিকে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিল—"বাবা!" তারপর গলায় আঁচল দিয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

অগ্ন্যুদ্গারী ভিসুভিয়াসের মাথার উপর উত্তর-মেরুর সমস্ত বরফ চাপাইয়া দিলে কি ফল হয় বলিতে পারি না, হৃষীকেশবাবুরও মুখের কোন ভাব-পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি ক্ষীণভাবে একটু হ্রেষাধ্বনি করিয়া বলিলেন, "তুমিই আমার পুত্রবধূ? তোমার নাম কি?"

"আমার নাম প্রতিমা"—বলিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছেই বসিয়া পড়িল। এইটুকু অভিনয় করিয়াই তাহার ঊরু দুটা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

হৃষীকেশবাবু চাহিয়া দেখিলেন—হাঁ, নাম সার্থক বটে। বধূর মুখ দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। শুনিয়াছিলেন বধূ আই-এ পাস, কিন্তু কৈ, তাহার আচরণে বিদ্যাভিমানের কোন চিহ্নই তো নাই। তিনি এক

দর্পিতা তীক্ষ্ণভাষিণী যুবতী মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু এ কি ? হৃষীকেশবাবু মনে মনে একবার হ্রেষাধ্বনি করিলেন, কিন্তু তাহা পুত্রদের উদ্দেশে। হতভাগারা তাঁহাকে বলে নাই কেন !

প্রতিমা শ্বশুরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আপনি বড্ড ঘেমেছেন, জামাটা খুলে ফেললে হ'ত না, বাবা ?"

হাতপাখা আনিয়া সে বাতাস করিবার উপক্রম করিতেই হৃষীকেশ-বাবু বলিয়া উঠিলেন, "থাক থাক, তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না, মা। আমি নিজেই বাতাস খাচ্ছি।"—বলিয়া ফেলিয়াই হৃষীকেশবাবু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এ ধরণের কথা গত তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার মুখ দিয়া একবারও বাহির হয় নাই।

পাশের ঘরের দরজায় কান লাগাইয়া শিশির নিস্পন্দ বক্ষে এতক্ষণ শুনিতেছিল ; এবার সে পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া গিয়া দেয়ালে-টাঙানো রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিল।

হৃষীকেশবাবু গায়ের জামা খুলিয়া মাদুরের উপর বসিলেন, পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে শয়তানটা ফিরবে কখন ? তোমাকে বুঝি এই রকম একলা ফেলে রেখে যায় ?"

চোখের জল ও মুখের হাসি এক সঙ্গে নিরুদ্ধ করিয়া প্রতিমা নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

হৃষীকেশবাবু গলা এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "স্টুপিড, বদমায়েস সব ! "শিশিরটাকেও বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছি। এমন বৌ আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল ! আজই আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব, দেখি কোন্ ব্যাটা কি করতে পারে।"

শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া প্রতিমা আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হৃষীকেশবাবু তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া নিজের থানের খুঁট দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া সগর্জনে কহিলেন, "কেঁদো না। আমি এই হেমন্তটাকে দেখে নেব। সব ঐ ছোঁড়ার শয়তানি—আমি বুঝেছি। গিন্নীও এর মধ্যে আছেন। আমাকে এতদিন বলেনি কেন? ষড়যন্ত্র! যত সব চোর-বোম্বেটের দল, নইলে এই বৌকে আমি দু-বচ্ছর বাইরে ফেলে রাখি?"

প্রতিমা শ্বশুরের কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, "বাবা, আমাকে বাড়িতে মার কাছে নিয়ে চলুন।"

"যাবই তো। এখনি নিয়ে যাব। আমি হৃষীকেশ রায়, আমি কি কারু তোয়াক্কা রাখি?" জামাটা গায়ে দিতে দিতে পুনরায় বলিলেন, "তোমায় নিয়ে যাব বলে নতুন মোটর কিনে নিয়ে একেবারে এসেছি। ট্রেনে তো আর তোমার যাওয়া হ'তে পারে না।"

হৃষীকেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিমা থতমত ভাবে একবার ঢোক গিলিয়া বলিল, "এক্ষুণি? কিন্তু বাবা—"

হৃষীকেশবাবু চড়া সুরে বলিলেন, "কিন্তু কি? সেই রাস্কেলটার অনুমতি নিয়ে তবে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে? (হ্রেষাধ্বনি করিলেন) আমি এই তোমাকে নিয়ে চললাম, ওদের যদি ক্ষমতা থাকে মোকদ্দমা করুক গিয়ে।"

প্রতিমা আর দ্বিরুক্তি করিল না, যেমন ছিল তেমনি বেশে শ্বশুরের সঙ্গে নামিয়া চলিল।

সদর দরজা পর্যন্ত গিয়া হৃষীকেশবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। উদ্বিগ্নভাবে পুত্রবধূর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "কিন্তু শুনেছিলাম—ঐ শিশির হতভাগা বলছিল যে, তুমি নাকি—তোমার নাকি—? কোন

ভয়ের কারণ নেই তো মা ? মোটরে প্রায় ষাট মাইল যেতে হবে। যদি কষ্ট হয়—যদি কোন রকম—”

আরক্ত মুখ কোনমতে ঘোমটায় ঢাকিয়া প্রতিমা তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়া উঠিল।

তিনটার সময় হেমন্ত বাড়ি ফিরিতেই শিশির ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “দাদা! বাবা এসেছিলেন, বৌদিকে বাড়ি নিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আমাদের ক্ষমতা থাকে তো যেন মোকদ্দমা করি!”—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ভাইয়ের কাছে সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া হেমন্ত স্মিতমুখে বলিল, “সব তো তুই-ই করলি। এখন আমি কি করব উপদেশ দে।”

অতঃপর দুই ভায়ে আধঘণ্টা ধরিয়া পরামর্শ করিয়া বিকালের গাড়ীতে বর্ধমান রওনা হইল।

রাত্রি আটটার সময় বৌমার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিয়া কর্তা দেখিলেন দুই ভাই হেমন্ত ও শিশির মায়ের ঘরের মেঝেয় আহারে বসিয়াছে। গৃহিণী সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতেছেন এবং নববধূ একখানা রেকাবি হস্তে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। হৃষীকেশবাবু ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, “এ দুটোকে কে বাড়ি ঢুকতে দিলে? নিশ্চয় খিড়কি দিয়ে ঢুকেছে! হুঁ—আস্পর্ধা! এখনি ওদের বেরিয়ে যেতে বলো।”

হেমন্ত ও শিশির কথা কহিল না, হেঁটমুখে আহার করিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, “কেন যাবে?—যাবে না। আর যায় যদি, বৌমাকে নিয়ে যাবে। আমিও যাব। দেখি তুমি কি করে আটকাও!”

হৃষীকেশবাবু কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "হুঁ! ভারি আস্পর্ধা হয়েছে। আচ্ছা, এখন কিছু বলছি না, বৌমার শরীর খারাপ, কিন্তু এর পরে—। বৌমা, তুমি শোও গে যাও, হতভাগাদের আর পরিবেশন করতে হবে না।" বলিয়া মধ্যম রকমের একটা হ্রেষাধ্বনি করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বৈঠকখানা হইতে কর্তার গলা শুনা গেল, "গয়া হতভাগা কোথায় গেল, তামাক দিয়ে যাক্।"

গয়ারামের এতবড় সৌভাগ্য জীবনে কখনও হয় নাই। সে নববধূ ঠাকুরাণীর পায়ের কাছে ঢিব করিয়া একটা গড় করিয়া বাহিরে ছুটিল।

হেমন্ত ও শিশির মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। গৃহিণী চোখের জল মুছিয়া ভাঙা গলায় বলিলেন, "যাও বৌমা, তোমার শ্বশুর হুকুম দিয়ে গেলেন, আজকের মতো শুয়ে পড়োগে মা, কাল ওদের পরিবেশন করে খাইও।"

রক্ত-সন্ধ্যা

মানুষের সহজ সাধারণ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার মাঝখানে ভূমিকম্পের মতো এমন এক-একটা ঘটনা ঘটিয়া যায় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া সেটাকে একটা অসম্ভব অঘটন বলিয়া মনে হয়। যে গল্পটা আজ বলিতে বসিয়াছি, সেটাও একদিন এমনই অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। যদিও শুধু দর্শক হিসাবে ছাড়া এ গল্পের সঙ্গে আমার কোনও সংশ্রব নাই, তবু ইহা আমার মনের উপর এমন একটা গভীর দাগ কাটিয়া দিয়াছে—যাহা বোধ করি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুছিবে না।

যে লোকটার কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি, আজ সাত দিন হইল সে হাইকোর্টের রায় মাথায় করিয়া পরলোকে যাত্রা করিয়াছে। সুতরাং সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত করিবার আমার আর উপায় নাই। তবে সংবাপত্রের নথি হইতে এবং আসামীর বিচারের সময় সাক্ষীদের মুখের যে যে কথা এই গল্পে কাজে আসিতে পারে, তাহা প্রয়োজনমত ব্যবহার করিব। বিশ্বাস আমি কাহাকেও করিতে বলি না এবং নিছক গাঁজা বলিয়া যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও আমার কোন নালিশ নাই। আমি শুধু এইটুকুই ভাবি যে, সে লোকটা মরিবার পূর্বে নিজের দোষ-ক্ষালনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও এতগুলি অনাবশ্যক মিথ্যা কথা বলিয়া গেল কেন?

এই সময় দৈনিক সংবাদপত্র 'কালকেতুতে' এই ঘটনার যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল, তাহাই সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"গতকল্য বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতার দুর্গাচরণ ব্যানার্জির লেনে এক কষাইয়ের দোকানে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া

গিয়াছে। দোকানের মালিক গোলাম কাদের অন্য দিনের ন্যায় যথারীতি মাংস বিক্রয় করিতেছিল। দোকানে কয়েকজন ফিরিঙ্গী ও মুসলমান খরিদ্দার উপস্থিত ছিল। এমন সময় একজন অপরিচিত ফিরিঙ্গী দোকানে প্রবেশ করিয়া কিছু গোমাংস খরিদ করিতে চাহে। তাহাকে দেখিয়াই দোকানদার গোলাম কাদের ভীষণ চিৎকার করিয়া মাংস-কাটা ছুরি হস্তে তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং নৃশংসভাবে তাহার বুকে, পেটে, মুখে ছুরিকাঘাত করিতে থাকে। আক্রান্ত ব্যক্তি মাটিতে পড়িয়া যায়, তখন গোলাম কাদের তাহার বুকের উপর বসিয়া এক একবার ছুরিকাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বলিতে থাকে, "ভাস্কো-ডা-গামা, এই আমার স্ত্রীর জন্যে—এই আমার কন্যার জন্যে—এই আমার বৃদ্ধ পিতার জন্যে!" দোকানে যাহারা ছিল সকলেই এই লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিয়া দ্রুত পলায়ন করিয়া পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ আসিয়া যখন গোলাম কাদেরকে গ্রেপ্তার করিল, তখন সে মৃত দেহের উপর ছুরি চালাইতেছে ও পূর্ববৎ বকিতেছে।

"সন্দেহ হয় যে, গোলাম কাদের হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে। কারণ হত ব্যক্তির সহিত পূর্ব হইতে তাহার পরিচয় ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে না এবং তাহার স্ত্রী, কন্যা বা বৃদ্ধ পিতা কেহই বর্তমান নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গোলাম কাদের প্রায় পনের বৎসর পূর্বে বিপত্নীক হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী এক মৃত কন্যা প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর সে আর বিবাহ করে নাই।

"পুলিশ-তদন্তে বাহির হইয়াছে যে, হত ব্যক্তি গোয়া হইতে নবাগত একজন পর্তুগীজ, ফিরিঙ্গী, ব্যবসায় উপলক্ষে কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় আসিয়া এক ক্ষুদ্র হোটেলে বাস করিতেছিল। তাহার নাম গেব্রিয়েল ডিরোজা।

"গোলাম কাদের এখন হাজতে আছে। ডিরোজার লাস পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।"

ঘটনাস্থলের খুব কাছেই আমার বাড়ি এবং অনেকদিন হইতে এই গোলাম কাদের লোকটার সহিত আমার মুখ-চেনাচিনি ছিল বলিয়াই ব্যাপারটা বেশি করিয়া আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহা ছাড়া আর একটি জিনিস আমার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল, সেটি ভাস্কো-ডা-গামার নাম। ছেলেবেলা হইতেই আমি ইতিহাসের ভক্ত, তাই হঠাৎ কষাইখানার হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নামটা উঠিয়া পড়ায় আমার মন সচকিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। 'ভাস্কো-ডা-গামা' সাধারণ প্রচলিত নাম নহে, একজন অশিক্ষিত মুসলমান কষাইয়ের মুখে এ নাম এমন অবস্থায় উচ্চারিত হইতে দেখিয়া কোন্ এক গুপ্ত রোমান্সের গন্ধে আমার মনটা ভরিয়া উঠিয়াছিল। কি অদ্ভুত রহস্য এই বিশ্রী হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে? কে এই গেব্রিয়েল ডিরোজা—যাহাকে হত্যাকারী ভাস্কো-ডা-গামা বলিয়া সম্বোধন করিল? সত্যই কি ইহা কেবলমাত্র এক বাতুলের দায়িত্বহীন প্রলাপ?

তা সে যাহাই হউক, কৌতূহল আমার এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, যে দিন এই মোকদ্দমা করোনারের কোর্টে উঠিল, সেদিন আমি একটু সকাল সকাল আদালতে গিয়া হাজির হইলাম। করোনার তখন উপস্থিত হন নাই, কিন্তু আসামীকে আনা হইয়াছে। চারিদিকে পুলিশ গিশ্ গিশ্ করিতেছে। আসামীর হাতে হাতকড়া—একটি টুলের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে চিনিতে পারিল এবং হাত তুলিয়া সেলাম করিল। পাগলের লক্ষণ কিছুই দেখিলাম না, নিতান্ত সহজ মানুষের মতো চেহারা। মুখে ভয় বা উৎকণ্ঠার কোনও চিহ্নই নাই।

দেখিয়া কে বলিবে, এই লোকটাই দুই দিন আগে এমন নির্দয়ভাবে আর একটা লোককে হত্যা করিয়াছে।

করোনার আসিয়া পড়িলেন। তখন কাজ আরম্ভ হইল। প্রথমেই ডাক্তার আসিয়া এজাহার দিলেন। তিনি বলিলেন, লাসের গায়ে সর্বশুদ্ধ সাতান্নটি ছুরিকাঘাত পাওয়া গিয়াছে। এই সাতান্নটির মধ্যে কোন্‌টি মৃত্যুর কারণ, বলা শক্ত। কারণ, সবগুলিই সমান সাংঘাতিক।

"ডাক্তারের জবানবন্দি শেষ হইলে জর্জ ম্যাথুস্ নামক একজন দেশী খৃস্টানকে সাক্ষী ডাকা হইল। অন্যান্য সওয়াল জবাবের পর সাক্ষী কহিল, "আমি গত দশ বৎসর প্রায় প্রত্যহ গোলাম কাদেরের দোকানে মাংস কিনিয়াছি; কিন্তু কোনও দিন তাহার এরূপ ভাব দেখি নাই। সে স্বভাবতঃ বেশ শান্ত শিষ্ট লোক।"

প্রশ্ন—আপনার কি মনে হয়, সে যে-সময় হত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে সে সময় সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না?

উত্তর—হত ব্যক্তি দোকানে প্রবেশ করিবার আগে পর্যন্ত সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল—আমাদের সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা কহিতেছিল; কিন্তু ডিরোজাকে দেখিয়াই একেবারে যেন পাগল হইয়া গেল।

প্রশ্ন—আপনার কি বোধ হয়, আসামী হত ব্যক্তিকে পূর্ব হইতে চিনিত?

উত্তর—হঁা; কিন্তু তাহার আসল নাম না বলিয়া ভাস্কো-ডা-গামা বলিয়া ডাকিয়াছিল।

প্রশ্ন—ডিরোজা আক্রান্ত হইয়া কোন কথা বলিয়াছিল?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—আসামী মদ বা অন্য কোনও নেশা করে, আপনি জানেন?

উত্তর—আমি কখনও তাহাকে নেশা করিতে বা মাতাল হইতে দেখি নাই।

প্রশ্ন—আসামীর ভাবে ইঙ্গিতে কি আপনার বোধ হইয়াছিল যে, সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য ডিরোজাকে খুন করিতেছে?

উত্তর—হাঁ। তাহার কথায় ও মুখের ভাবে আমার মনে হইয়াছিল যে, ডিরোজা পূর্বে তাহার স্ত্রী, কন্যা ও বৃদ্ধ পিতার উপর কোনও অত্যাচার করিয়া থাকিবে।

জর্জ ম্যাথুসের পরে আরও কয়েকজন সাক্ষী প্রায় ঐ মর্মে এজাহার দিবার পর পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এজেহার দিতে উঠিলেন। তিনি বলিলেন যে, গোয়া হইতে খবর পাইয়াছেন যে, ডিরোজা সেখানকার এক জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, জাতিতে ফিরিঙ্গী পর্তুগীজ্—বয়স বেয়াল্লিশ বৎসর। সে পূর্বে কখনও গোয়া ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাই—জীবনে এই প্রথম কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিল। আসামী সম্বন্ধে ডেপুটি কমিশনার বলিলেন,—আসামীর আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, পুত্র পরিবার কেহ নাই, অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। তাহার বয়স অনুমান সাতচল্লিশ বৎসর। সুতরাং ডিরোজার সহিত তাহার যে পূর্বে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না।

আসামী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এবার সে কথা কহিল, বলিল, "ডা-গামাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি।"

মুহূর্তমধ্যে ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। করোনার ডেপুটি কমিশনারকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ডিরোজাকে পূর্ব হইতে জানো?"

আসামী বলিল, "ডিরোজাকে আমি কখনও দেখি নাই—আমি ভাস্কো-

ডা-গামাকে চিনি। ভাস্কো-ডা-গামা ছদ্মবেশে আমার দোকানে মাংস কিনিতে আসিয়াছিল।"

করোনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আসামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা' ভাস্কো-ডা-গামাকে তুমি কোথায় দেখিয়াছ ?"

আসামী কহিল, "প্রথম দেখি কালিকটের বন্দরে—শেষ দেখি সমুদ্রের বুকের উপর—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আসামী হঠাৎ থামিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। সে অবরুদ্ধকণ্ঠে একবার 'ইয়া খোদা !'—বলিয়া দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল—আর কোনও কথা বলিল না।

তারপর করোনার যথাসময় রায় দিলেন যে, ক্ষণিক উন্মত্ততার বশে গোলাম কাদের ডিরোজাকে খুন করিয়াছে।

কোর্ট হইতে যখন বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার মাথার ভিতর ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। 'কালিকট,' 'সমুদ্রের বুকের উপর' আসামী এ সব কি বলিল ? আরও কত কথা, না জানি কোন্ অপূর্ব কাহিনী এই মূর্খ নিরক্ষর কষাই গোলাম কাদেরের বুকের মধ্যে লুকানো আছে। কারণ, সে যে পাগলামীর ভাণ করিতেছে না, তাহা নিঃসন্দেহ। কোনও কথা বা কাজই তাহার পাগলের মতো নহে। অথচ দুই একটা অসংলগ্ন কথার ভিতর দিয়া অতীতের পর্দার একটা কোণ তুলিয়া ধরিয়া এ কি এক আশ্চর্য রূপকথার ইঙ্গিত দিয়া গেল !

ইহার পর গোলাম কাদেরের ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিস্তারিতভাবে বলিবার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। দায়রা-সোপর্দ হইয়া মামলা হাইকোর্টে উঠিলে হাইকোর্টের জজবাহাদুর গোলাম কাদেরকে এক মাস ডাক্তারের নজরবন্দিতে থাকিবার হুকুম

দিলেন। এক মাস পরে ডাক্তারের রিপোর্ট আসিল—গোলাম কাদের সুস্থ সহজ মানুষ, পাগলামির চিহ্নমাত্র তাহার মধ্যে নাই। তার পর বিচার। বিচারে গোলাম কাদের নিজের উকিলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিল, "আমি খুন করিয়াছি, সে জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা অনুতপ্ত নই। আবার যদি তাহার সহিত দেখা হয়, আবার তাহাকে এমনই ভাবে হত্যা করিব।"

হাইকোর্ট নিরুপায় হইয়া তাহার ফাঁসির হুকুম দিলেন।

আমি শেষ পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত ছিলাম। গোলাম কাদেরের জীবননাট্যে বিচারের অঙ্কটা শেষ হইয়া গেলে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিচারে তাহার মুক্তির প্রত্যাশা কোন দিনই করি নাই, কিন্তু তবু অকারণে মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। বুকের নিভৃত স্থানে যেন একটা সংশয় লাগিয়াই রহিল যে, এ সুবিচার হইল না, কোথায় যেন কি একটা অত্যন্ত জরুরী প্রমাণ বাদ পড়িয়া গেল।

এই সব নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় কয়েক জন পুলিসের লোক আসামীকে বাহিরে লইয়া আসিল। আমি গোলাম কাদেরের মুখের দিকে চাহিতেই সে ইসারা করিয়া আমাকে কাছে ডাকিল। তারপর গলা নামাইয়া বলিল, "বাবুজী, আপনি আমার মোকদ্দমার সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। আমি তো চলিলাম, আমার একটি শেষ আর্জি আছে--একবার জেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, আমার কিছু বলিবার আছে।"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয় করিব।"

গোলাম কাদের হাতকড়া-বাঁধা দুই হাত তুলিয়া আমাকে সেলাম করিয়া জেলের গাড়িতে চড়িয়া চলিয়া গেল।

তার পর কি করিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া জেলে তাহার সহিত

দেখা করিলাম, সে বিবৃতি এখানে অনাবশ্যক। শুধু কন্‌ডেম্‌ড্‌ আসামীর কক্ষে বসিয়া মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে সে আমাকে যে গল্প বলিয়াছিল, তাহাই বাংলাভাষায় অনূদিত করিয়া আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিতেছি।—

গোলাম কাদের বলিল, "বাবুজী, আমার এই কাহিনী আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি যে পাগল নই আমার এই কথাটি আপনি অবিশ্বাস করিবেন না। সত্য কথা বলিতে কি, আমার কাছেও ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি কিতাব পড়ি নাই, আজীবন মাংস বিক্রয় করিয়াছি। গল্প বানাইয়া বলিবার শক্তি আমার নাই। যাহা আজ বলিব, তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই বলিব। অথচ এ সকল ঘটনা আমার—এই গোলাম কাদেরের জীবনে যে ঘটে নাই, তাহাও নিশ্চিত। আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব জানি না, আমি মূর্খ লোক। শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, ইহা আজিকার ঘটনা নয়, বহু বহু যুগের পুরাতন।

"তবে সুরু হইতেই কথাটা বলি। পনের-ষোল বৎসর পূর্বে আমার স্ত্রী এক কন্যা প্রসব করিতে গিয়া মারা যায়, মেয়েটিও মারা গেল। কি করিয়া জানি না, আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, কোনও দুষমন আমার স্ত্রী-কন্যাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। শোকের অপেক্ষা ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় আমার অন্তঃকরণ অধিক পূর্ণ হইয়া উঠিল; সর্বদাই মনে হইত, যদি সেই অজ্ঞাত দুষমনটাকে পাই, তাহা হইলে তাহার প্রতি অঙ্গ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ইহার প্রতিশোধ লই।

"এই ভাবে কিছুদিন কাটিবার পর ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা আমার ভ্রান্তি—সত্যের উপর ইহার কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। তার পর যত দিন কাটিতে লাগিল, আস্তে আস্তে শোক এবং ক্রোধ দুই ভুলিতে লাগিলাম; কিন্তু আর বিবাহ করিতে পারিলাম না। শেষ পর্য্যন্ত

হয় তো জীবনটা আমার এমনই সহজভাবে কাটিয়া যাইত, যদি না সে দিন অশুভক্ষণে সেই লোকটা আমার দোকানে পদার্পণ করিত।

"শুনিয়াছি, মানুষ জলে ডুবিলে তাহার বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা ছবির মতো চোখের পর্দার উপর দেখিতে পায়। এই লোকটাকে দেখিবামাত্র আমারও ঠিক তাহাই হইল। এক মুহূর্তের মধ্যে চিনিয়া লইলাম—এই সেই নৃশংস রাক্ষস, যে আমার স্ত্রী-কন্যা এবং পিতাকে হত্যা করিয়াছিল। ছবির মতো সে সকল দৃশ্য আমার চোখের উপর জাগিয়া উঠিল। মজ্জমান জাহাজের উপর সেই মরণোন্মুখ অসহায় যাত্রীদের হাহাকার কানে বাজিতে লাগিল। ভাস্কো-ডা-গামার সেই ক্রূর হাসি আবার দেখিতে পাইলাম।

"আমার জজসাহেবরা হত্যার কারণ খুঁজিতেছিলেন, কৈফিয়ৎ চাহিতেছিলেন। বাবুজী, আমি কি কৈফিয়ৎ দিব, আর দিলেই বা তাহা বুঝিত কে?

"আপনি হয়তো বুঝিবেন। আপনার চোখে মুখে আমি তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাই আপনাকে এই কষ্ট দিয়াছি। ইহাতে ফল কিছু হইবে না জানি, কিন্তু আমার হৃদয়ভার লাঘব হইবে; এ ছাড়া আমার অন্য স্বার্থ নাই।

"আমার এই কষাই-জীবনের ইতিহাসটা এখানেই শেষ করিতেছি। এবার যাহার কথা আরম্ভ করিব, তাহার নাম মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদ্‌কী। আমিই যে এই মির্জা দাউদ, তাহা এখন ভুলিয়া যান। মনে করুন, ইহা আর কাহারও জীবনের কাহিনী।—"

* * * * *

কালিকটের নাম আপনি শুনিয়া থাকিবেন। মালাবার উপকূলে অতি সুন্দর মহার্ঘ মণিখণ্ডের মতো একটি ক্ষুদ্র নগর। মোরগের ডাক

যতদূর শুনা যায়, ততদূরে তাহার নগর-সীমানা। নগরের পশ্চাতে ছোট ছোট পাহাড়, উপত্যকা, কঙ্করপূর্ণ সমতল ক্ষেত্র, এবং তাহার পশ্চাতে অভ্রভেদী পশ্চিমঘাট সমস্ত পৃথিবী হইতে যেন এই স্থানটুকুকে পৃথক করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সম্মুখে অপার সমুদ্র ভিন্ন কালিকটে প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণের অন্ত সুগম পথ নাই। এই সমুদ্রপথে অসংখ্য বাণিজ্যতরণী কালিকটের বন্দরে প্রবেশ করে, আবার পাল তুলিয়া সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়। কালিকট যেন পৃথিবীর সমগ্র বণিক-সমাজের মোসাফিরখানা।

পীতবর্ণ চৈনিক, তাম্রবর্ণ বাঙালী, লোহিতবর্ণ পারসিক, কৃষ্ণবর্ণ মূর—সকলেই কালিকটের পথে সমান দর্পে পা ফেলিয়া চলে, কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। চীন হইতে লাক্ষা, দারুশিল্প; ব্রহ্ম হইতে গজদন্ত; মলয়দ্বীপ হইতে চন্দন; বঙ্গ হইতে ক্ষৌম পট্টবস্ত্র, মলমল, ব্যাঘ্রচর্ম; চম্পা ও মগধ হইতে চামর, কস্তুরী, চারুকেশরার পুষ্পবীজ; দাক্ষিণাত্য হইতে অগুরু, কর্পূর, দারুচিনি; লঙ্কা হইতে মুক্তা আসিয়া কালিকটে স্তূপীকৃত হয়। পশ্চিম হইতে তুরস্ক, পারসিক, আরব ও মূর সওদাগর তাহাই স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া জাহাজে তুলিয়া, কেহ বা পারস্যোপসাগরের ভিতর দিয়া ইউফ্রাটেস্ নদের মোহনায় উপস্থিত হয়, কেহ বা লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে নীলনদের সন্নিকটে গিয়া তরণী ভিড়ায়। তথা হইতে প্রাচী-র পণ্য সমগ্র পাশ্চাত্য খণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে। কালিকটের রাজা সামরী বাণিজ্যতরণীর শুল্ক আদায় করিয়া রাজ্যের ব্যয়ভার নির্বাহ করেন। রাজকোষ সর্বদা সুবর্ণ-মণিমাণিক্যে পূর্ণ। রাজ্যে কোথাও দৈন্য নাই, অশান্তি নাই, অসন্তোষ নাই; ইতর-ভদ্র সকলেই সুখী।

মির্জা দাউদ এই কালিকটের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। তাঁহার

একুশখানি বাণিজ্যতরী আছে,—হোয়াংহো হইতে নীলনদের প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহাদের গতিবিধি। যখন এই তরণী সকল শুভ্র পাল তুলিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সমুদ্রযাত্রায় বাহিত হয়, তখন মনে হয়, রাজহংসশ্রেণী পক্ষ বিস্তার করিয়া নীল আকাশে ভাসিয়া চলিয়াছে।

মির্জা দাউদ জাতিতে মূর। কালিকটে তাঁহার শ্বেত-প্রস্তরের প্রাসাদ মূর প্রথায় নির্মিত। সুদূর মরক্কো দেশে এখনও তাঁহার বৃদ্ধ পিতা বর্ত্তমান; কিন্তু তিনি কালিকটেই মাতৃভূমিত্বে বরণ করিয়াছেন। অনেক বৈদেশিক সওদাগরই এরূপ করিয়া থাকেন। মির্জা দাউদ ধর্ম্মে মুসলমান হইলেও একপত্নীক। সম্প্রতি চৌত্রিশ বৎসর বয়সে প্রথমে একটি কন্যা জন্মিয়াছে। কন্যার জন্মদিনে মির্জা দাউদ এক সহস্র তোলা সুবর্ণ বিতরণ করিয়াছেন—তার পর তাঁহার গৃহে সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলিয়াছিল। নগরে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল।

বস্তুতঃ মির্জা দাউদের মতো সর্বজনপ্রিয় বহু-সম্মানিত ব্যক্তি নগরে আর দ্বিতীয় নাই। উচ্চ-নীচ, ধনি-নির্ধন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। স্বয়ং রাজা সামরী তাঁহাকে বন্ধুর মধ্যে গণ্য করেন। এ দিকে ব্যবসায়ে দিন দিন অধিক অর্থাগম হইতেছে। মানুষ পৃথিবীতে যাহা কিছু পাইলে সুখী হয়; কিছুই তাঁহার অভাব নাই।

একদিন গ্রীষ্মের সায়াহ্নে পশ্চিম দিগ্বলয় রঞ্জিত করিয়া সূর্যাস্ত হইতেছে। সমুদ্রের জল যতদূর দৃষ্টি যায়, রাঙা হইয়া টলটল করিতেছে। দূর লাক্ষাদ্বীপ হইতে সুগন্ধ বহন করিয়া স্নিগ্ধ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আকাশ মেঘ-নির্মুক্ত।

সমস্ত দিন গরম ভোগ করিয়া নগরের নরনারী শীতল বায়ু সেবন করিবার জন্য এই সময় বন্দরের ঘাটে আসিয়া জমিয়াছে। বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঘাট—বড় বড় চতুষ্কোণ পাথর দিয়া বাঁধানো। পাথরের

উপর সারিসারি জাহাজ বাঁধিবার লোহার কড়া। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল ঐ ঘাটের কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, আবার ভাঁটার সময় সিক্ত বালুকারাশি মধ্যে রাখিয়া দূরে সারিয়া যায়। এই ঘাটই নগরের কর্মকেন্দ্র। ক্রয়-বিক্রয়, দরবস্তুর, আমোদ-প্রমোদ সমস্তই এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। তাই সকল সময় এখানে মানুষের ভিড়।

সে সময় ঘাটে একটিও নবাগত কিংবা বহির্গামী বাণিজ্যতরী ছিলনা। কাজকর্ম কিছু শিথিল। নাগরিকগণ নানা বিচিত্র বেশ পরিধান করিয়া কেহ সস্ত্রীক সপুত্রকন্যা পাদচারণ করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিয়াছে। চঞ্চলমতি কিশোরগণ ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে; আবার কেহ বা ঘাট হইতে সমুদ্রের জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিতেছে।

চীনদেশীয় এক বাজিকর নানা প্রকার অদ্ভুত খেলা দেখাইতেছে। জনতার মধ্য হইতে মাঝে মাঝে উচ্চ হাসির রোল উঠিতেছে।

বাজিকর একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় সিংহলীকে ধরিয়া তাহার কানের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তোমার মাথার মধ্যে ২৫৬টি পাথরের নুড়ি রহিয়াছে, বলো তো বাহির করিয়া দিই।" অমনিই জনতা সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল, "বাহির কর, বাহির কর।" তখন বাজিকর ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষুদ্র চিম্‌টা দিয়া তাহার কর্ণ হইতে সুপারীর মতো বড় বড় অসংখ্য পাথর বাহির করিয়া মাটিতে স্তূপীভূত করিল। প্রৌঢ় সিংহলী বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহা দেখিতে লাগিল। ভারি হাসির একটা ধুম পড়িয়া গেল। একজন পরিহাস করিয়া বলিল, "শেঠ্, তোমার মাথা যে এত নিরেট, তাহা জানিতাম না!"

ক্রমে সূর্য অস্তমিত হইল। সমুদ্রের গায়ে সীসার রং লাগিল। দিগন্তরেখার যে স্থানটায় সূর্য অস্ত গিয়াছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সন্ধ্যার রক্তিমাভা ধীরে ধীরে সংকুচিত হইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় দূর সমুদ্রবক্ষে সেই রক্তিমাভার সম্মুখে তিনটি কৃষ্ণবর্ণের ছায়া আবির্ভূত হইল। সকলে দেখিল, তিনখানি জাহাজ বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

তখন, জাহাজ কোথা হইতে আসিয়াছে, কাহার জাহাজ, ইহা লইয়া ঘাটের দর্শকদিগের মধ্যে তর্ক চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, আরবী জাহাজ, কেহ বলিল চীনা; কিন্তু অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল—কোন্ দেশীয় জাহাজ, নিশ্চয়রূপে কিছু বুঝা গেল না।

মির্জা দাউদ ঘাটে ছিলেন। তিনি বহুক্ষণ একদৃষ্টে সেই জাহাজ তিনটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "পোর্তুগীজ জাহাজ!—কিন্তু ফিরিঙ্গী কোন্ পথে আসিল?"

তার পর গগনপ্রান্তে দিবা-দীপ্তি নিবিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি জীর্ণ সিন্ধুবিধ্বস্ত ক্ষুদ্র পোত ছিন্ন পাল নামাইয়া কালিকটের বন্দরে আসিয়া ভিড়িল।

পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মির্জা দাউদ বন্দরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—কয়েকজন বিদেশীকে ঘিরিয়া ভারি ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ফিরিঙ্গীগণ অপরিচিত ভাষায় কি বলিতেছে, কেহই বুঝিতেছে না এবং প্রত্যুত্তরে নানা দেশীয় ভাষায় তাহাদের প্রশ্ন করিতেছে। মির্জা দাউদ ভিড় ঠেলিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সকলে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল।

আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন বলিল, "এখানে পোর্তুগীজ ভাষা বুঝে, এমন কেহ কি নাই? আমি জামোরিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই—দোভাষী খুঁজিতেছি।"

মির্জা দাউদ দেখিলেন, বক্তা শালপ্রাংশু বিশালদেহ এক পুরুষ।

তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, দীর্ঘ স্বর্ণাভ কেশ এবং হ্রস্ব সূচ্যগ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল। ঊর্ধ্বাঙ্গে সোনার জরির কাজ-করা অতি মূল্যবান্ মখমলের অঙ্গরক্ষা, কটি হইতে জানু পর্যন্ত ঐ মখমলের জাঙিয়া এবং জানু হইতে নিম্নে পদদ্বয় চর্মনির্মিত খাপে আবৃত। মস্তকে টুপির উপর কঙ্কপত্র বক্রভাবে অবস্থিত; এই পুরুষের সহিত অন্য পাঁচ ছয় জন যাহারা রহিয়াছে, তাহারাও প্রায় অনুরূপ বেশধারী। সকলের কটিবন্ধে তরবারি।

মির্জা দাউদ এই প্রধান পুরুষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমি পোর্তুগীজ ভাষা বুঝি।"

নবাগত কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে মির্জা দাউদের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ অন্ধকার হইল। সে ধীরে ধীরে কহিল, "তুমি দেখিতেছি মূর!"

এই তিনটি শব্দের অন্তর্নিহিত যে সুতীক্ষ্ণ ঘৃণা, তাহা মির্জা দাউদকে বিদ্ধ করিল। তিনিও মনোগত বিদ্বেষ গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, আমি মূর। তোমরা দেখিতেছি পোর্তুগীজ—জলদস্যু; তোমাদের সহিত পরিচয় আমার প্রথম নহে, কিন্তু ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব নাই।"

এতক্ষণে দ্বিতীয় একজন পোর্তুগীজ কথা কহিল। তাহার বয়স অল্প, উদ্ধত কণ্ঠে বলিল, "মূর কুকুরের সহিত আমরা সদ্ভাব রাখি না—মূরের উচ্ছেদ করাই আমাদের ধর্ম।"

নিমেষ মধ্যে মির্জা দাউদের কটি হইতে ছুরিকা বাহির হইয়া আসিল, দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই আগন্তুকদিগের প্রধান ব্যক্তি হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল। বিনীতস্বরে কহিল, "মহাশয়, আমার এই স্পর্ধিত সঙ্গীকে ক্ষমা করুন। আপনি মূর এবং আমরা

পোর্তুগীজ বটে ; কিন্তু আমরা উভয়েই ব্যবসায়ী, জলদস্যু নহি। অন্যত্র যাহাই হোক্, এখানে আমার সহিত আপনাদের বিবাদ নাই। বরঞ্চ আপনার হৃদ্যতা লাভ করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।" তারপর নিজ সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "পেড্রো, আর কখনও যদি তোমার মুখে এরূপ কথা শুনিতে পাই, তোমার প্রত্যেক অস্থি চাকায় ভাঙিয়া তারপর ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইব।"

ভয়ে পেড্রোর মুখ পীতবর্ণ হইয়া গেল ; কিন্তু তথাপি সে কম্পিত বিদ্রোহের কণ্ঠে কহিল, "আমি সত্য কথা বলিতে ভয় করি না। মূরমাত্রেই আমাদের ঘৃণার পাত্র। আপনি নিজেও তো মূরকে—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের মতো দুই হাত বাড়াইয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। বজ্রমুষ্টিতে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া থাকিবার পর ছাড়িয়া দিতেই পেড্রো হতজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার প্রতি আর দৃক্‌পাত না করিয়া প্রথম ব্যক্তি মির্জা দাউদের দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিল, "মিথ্যা-বাদীর দণ্ডদান ধার্মিকের কর্তব্য। এখন দয়া করিয়া আমার সহিত জামোরিনের নিকট গিয়া আমার নিবেদন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।"—বলিয়া মাথার টুপি খুলিয়া আভূমি লুণ্ঠিত করিয়া অভিবাদন করিল। দর্শকবৃন্দ—যাহারা পোর্তুগীজ ভাষা বুঝিল না, তাহারা অবাক হইয়া এই দুর্বোধ্য অভিনয় দেখিতে লাগিল।

মির্জা দাউদ আগন্তুকের মিষ্ট বাক্যে ভুলিলেন না, অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, "ফিরিঙ্গী, তুমি অতি ধূর্ত। কি জন্য সামরীর রাজ্যে আসিয়াছ, সত্য বল।"

"বাণিজ্য করিতে।"

"খৃস্টান, আমি তোমাদের চিনি। কলহ তোমাদের ব্যবসায়, লোভ

তোমাদের ধর্ম, পরশ্রীকাতরতা তোমাদের স্বভাব। এ রাজ্যে কলহ-বিদ্বেষ নাই—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, হিব্রু নির্বিবাদে শান্তিতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছে। সত্য বল, তোমরা কি উদ্দেশ্যে এই হিন্দে পদার্পণ করিয়াছ?"

ফিরিঙ্গীর মুখ রক্তহীন হইয়া গেল। শুধু তাহার চক্ষুযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো নিষ্ফল ক্রোধ ও হিংসা বিকীর্ণ করিতে লাগিল; কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সংবরণ করিয়া কণ্ঠবিলম্বিত সুবর্ণ-ক্রুশ হস্তে তুলিয়া বলিল, "এই ক্রুশ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি—সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া বাণিজ্য করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উদ্দেশ্য নাই।"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মির্জা দাউদ কহিলেন, "তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম। চল, সামরীর প্রাসাদে তোমাদের লইয়া যাই।"

তখন বিদেশীরা মির্জা দাউদের অনুসরণ করিয়া রাজপ্রাসাদ অভিমুখে চলিল। পেড্রোর সংজ্ঞাহীন দেহ ঘাটের পাথরের উপর মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সামরীর সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া পোর্তুগীজ বণিকদিগের অধিনায়ক বলিল, "আমার নাম ভাস্কো-ডা-গামা—আমি পোর্তুগালের রাজদূত। আপনার নিকট কালিকটে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।" এই বলিয়া পোর্তুগাল-রাজ-প্রেরিত মহার্ঘ উপঢৌকন সকল সামরীর সম্মুখে স্থাপন করিতে সঙ্গিগণকে ইঙ্গিত করিল।

মুখে যাহাই বলুন, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস মির্জা দাউদের অন্তর হইতে দূর হইল না। তিনি ফিরিঙ্গীকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন—মূরমাত্রেই

চিনিত। স্বদেশে বহু সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তাহারা জানিত যে ফিরিঙ্গী অতিশয় স্বার্থলিপ্সু ও ভোগলুব্ধ। ইহাদের জন্মভূমি অর্থপ্রসূ নহে; তাই অন্নের জন্য ইহাদিগকে দৈহিক ও মানসিক কঠোরতার মধ্যে জীবনযাপন করিতে হয় বটে, কিন্তু এই জন্যই ইহারা অপেক্ষাকৃত ধনী মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঈর্ষা করে। পরের উন্নতি ইহাদের চক্ষুশূল। কোথাও একবার ধনরত্ন-ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইলে ইহাদের লালসা ও ক্ষুধা এত উগ্র, নির্মম হইয়া উঠে যে, কোনও মতে সেখানে প্রবেশ লাভ করিয়া নিজেকে একবার ভালোরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শত্রুমিত্রনির্বিচারে সকলের উপর দুর্বিনীত বাহুবল, স্পর্ধা ও জুলুম প্রকাশ করিতে থাকে। ইহারা নিরতিশয় কলহপ্রিয় ও যুদ্ধনিপুণ। স্বার্থরক্ষার জন্য এমন কাজ নাই যাহা ইহারা পারে না এবং স্বজাতির স্বার্থবর্ধনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে ইহারা তিলমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

পোর্তুগাল হইতে সমুদ্রপথে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া আজ পর্যন্ত কেহ ভারতবর্ষে আসে নাই, এ পথ এতদিন অজ্ঞাত ছিল। ভাস্কো-ডা-গামা সেই পথ ইউরোপীয়দের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বহু নূতন সম্ভাবনা ও দুর্ভাবনার সৃষ্টি করিল। সম্প্রতি ভাস্কো-ডা-গামার উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ভাবে বুঝা যায় না। অথচ উদ্ধত ও কটুভাষী পেড্রোর কণ্ঠরোধ করিয়া সে যে একটা গূঢ় অভিপ্রায় গোপন করিয়া গেল, তাহাও বুঝিতে মির্জা দাউদের বিলম্ব হইল না। শঙ্কা ও সংশয়ের মেঘে তাঁহার মন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

পোর্তুগীজগণ কালিকটে বাস করিতে লাগিল এবং দিন দিন নূতন পণ্যে তরণী পূর্ণ করিতে লাগিল। অতি অপদার্থ পণ্য দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য দিয়া কিনিতে লাগিল। ইহাতে নির্বোধ ব্যবসায়িরা যতই উৎফুল্ল হউক না কেন, মির্জা দাউদের ন্যায় বহুদর্শী শ্রেষ্ঠীদের মনে সন্দেহ তত

বশীভূত হইয়া উঠিল। উচিত মূল্যের অধিক মূল্য দিয়া পণ্য ক্রয় করা ব্যবসায়ীর স্বভাব নহে, অথচ নবাগতরা অধ্যবসায়ী বা নির্বোধ নহে। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য ছলমাত্র, অন্য কোনও দুরভিসন্ধি তাহাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহা অনুমান করিয়া বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদের চিন্তা ও উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না।

এইরূপে কিছুকাল বিগত হইল। কালিকটের জীবনপ্রবাহ পূর্ববৎ প্রশান্তভাবে চলিতে লাগিল। একদিন শরৎকালে মেঘমার্জিত আকাশে শুভ্র পাল উড়াইয়া দুইটি জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, বঙ্গদেশ হইতে প্রভাকর শ্রেষ্ঠীর নৌকা আসিতেছে। প্রভাকর শেঠ অতি প্রসিদ্ধ বণিক—প্রতি বৎসর এই সময় লক্ষাধিক মুদ্রার বস্ত্রাদি পণ্য বহন করিয়া তাহার তরণী কালিকটে উপস্থিত হয়। কাশ্মীরের শাল, বারাণসীর চেলি, কৌশেয় পট্ট, বাংলার মলমল কিনিবার জন্য কালিকটের সওদাগর-সমাজে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। এত সুন্দর এবং এত মূল্যবান বস্ত্র কেহই আনিতে পারে না, সে জন্য প্রভাকরের এত খ্যাতি।

প্রভাকরের নৌকা ঘাটে লাগিবার পূর্বেই নগরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা ঘাটে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রভাকর নৌকার উপর দাঁড়াইয়া পরিচিত সকলকে নমস্কার-সংভাষণাদি করিতে লাগিল। সে অতিশয় বাক্‌পটু ও রহস্যপ্রিয়, এজন্য সকলেই তাহাকে ভালোবাসিত।

হিব্রু মূশা ইব্রাহিম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভাকর, এবার তোমার দেরি দেখিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আর আসিলে না—পথে তোমাদের সুন্দরবনের কুমীর তোমাকে পেটে পুরিয়াছে।"

প্রভাকর হাসিয়া বলিল, "মূশা সাহেব, পেটে পুরিলেও কুমীর আমাকে হজম করিতে পারিত না!—এই যে মির্জা সাহেব! আদাব

আদাব—শরীর-গতিক সব ভালো তো? এবার আপনার ফরমাসী জিনিস সমস্ত আনিয়াছি, কত লইতে পারেন দেখিব। আপনার কোমরে তলোয়ারখানি নূতন দেখিতেছি, ডামাস্কাসের বুঝি? আমার কিন্তু এক জোড়া চাই—গৌড়েশ্বরের কাছে বাক্যদত্ত হইয়া আছি। ভালো কথা, পথে আসিতে শ্রীখণ্ডের নিকট আপনার যবদ্বীপ-যাত্রী জাহাজের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল—খবর সব ভালো।—হায়দার মুস্তফা যে, ইতিমধ্যে কয়টি সাদি করিলেন? এবার কিন্তু ইস্পাহানী আঙ্গুরের রস না খাওয়াইলে বড়ই অন্যায় হইবে।—জাম্বো, শাঁখালুর মতো দাঁত বাহির করিয়া হাসিল না—দড়িটা ধর্।"

নৌকা বাঁধা হইলে প্রভাকর ঘাটে নামিয়া সকলের সহিত আলিঙ্গনাদি করিল। তখন মির্জা দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাকর, কি কি সওদা আনিলে?"

প্রভাকর বলিল, "এবার যে মলমল আনিয়াছি, মির্জা সাহেব, তেমন মলমল আজ পর্যন্ত কখনও চোখে দেখেন নাই। মাকড়শার জালের চেয়েও নরম, কাশফুলের চেয়েও হাল্কা—মুঠির মধ্যে দেড়শ গজ কাপড় ধরা যায়; কিন্তু এক থান কাপড়ের দাম পাঁচ তোলা সোনা, তার কমে দিতে পারিব না। কোচিনে চার তোলা পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিল—আমি লই নাই। শেষে কি লোকসান দিয়া ঘরে ফিরিব? শেঠ্‌নী তাহা হইলে আমার মুখ দেখিবে না।"

মির্জা দাউদ হাসিয়া বলিলেন, "তা না দেখুক। তোমার মুখ না দেখিলেও শেঠনীর কোনও লোকসান হইবে না।—এখন তোমার সওদা দেখাও।"

প্রভাকর বলিল, "বলেন কি মির্জা সাহেব, লোকসান হইবে না? শেঠনীর এখন যৌবনকাল, কাঁচা বয়স; এখন স্বামীর মুখদর্শন না

করিলে জীবন-যৌবন সমস্তই লোকসান হইয়া যাইবে যে!—ভালো কথা, গতবারে শুনিয়াছিলাম, আপনার বিবি-সাহেবা না কি অসুস্থ। তা কোনও শুভ সংবাদ আছে না কি?"

মির্জা দাউদ বলিলেন, "খোদার দয়ায় একটি মেয়ে হইয়াছে—"

প্রভাকর বলিল, "এত বড় আনন্দের সংবাদ এতক্ষণ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন! আমাদের দেশে বলে, মেয়ে হইলে পিতার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে আজ রাত্রে আপনার দৌলতখানায় আমার নিমন্ত্রণ রহিল। দেশে কুক্কুটাদি ভোজনের সুবিধা হয় না— দুষ্প্রাপ্যও বটে, আর ব্রাহ্মণগুলা বড়ই গণ্ডগোল করে।—ও বাবা! এটি আবার কে, মির্জা সাহেব? এ রকম পোষাক-পরিচ্ছদ তো কখনও দেখি নাই। ইহারা কোথা হইতে আসিল?"

মির্জা দাউদ ফিরিয়া দেখিলেন, ভাস্কো-ডা-গামা দুই জন সহচর সঙ্গে সেই দিকে আসিতেছে। ইতিমধ্যে কালিকটের পথে-ঘাটে দুই জনের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু কোন পক্ষেই সৌহার্দ্য বর্ধনের আগ্রহ দেখা যায় নাই। বরঞ্চ উভয়ে উভয়কে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছেন।

প্রভাকরের প্রশ্নের উত্তরে মির্জা দাউদ কহিলেন, "ইহারা পোর্তুগীজ। ক্রমে পরিচয় পাইবে।"

ইত্যবসরে প্রভাকরের নৌকা হইতে পণ্যসামগ্রী-সকল পরিদর্শনের জন্য ঘাটে নামানো হইতেছিল। সওদাগরেরা ভিড় করিয়া তাহাই দেখিতেছিলেন। মির্জা দাউদও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। অন্য দিক হইতে ভাস্কো-ডা-গামাও আসিয়া মিলিত হইল।

মলমলের নমুনা দেখিয়া মির্জা দাউদ কহিলেন, "অতি উৎকৃষ্ট মলমল। প্রভাকর, এ জিনিস কত আনিয়াছ?"

প্রভাকর সগর্বে বলিল, "পূরা এক জাহাজ।"

দাউদ কহিলেন, "ভালো, আমি এক জাহাজই লইলাম। দর-দামের কথা আজ রাত্রে স্থির হইবে।"

ভাস্কো-ডা-গামা এরূপ অপূর্ব সূক্ষ্ম মলমল পূর্বে কখনও দেখে নাই। বস্তুতঃ এত মহার্ঘ মলমল পারস্য দেশ ভিন্ন অন্য কোথাও যাইত না। পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে যাহা যাইত, তাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মলমল। ডা-গামার অন্তর লুব্ধ হইয়া উঠিল। পোপ এবং রাজা ইম্যানুয়েলকে নজর দিতে হইলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কি আছে? সে বলিল, "এ মলমল আমি কিনিব।"

মির্জা দাউদ হাসিয়া বলিলেন, "আর উপায় নাই। এই মলমল আমি কিনিয়াছি।"

ডা-গামা প্রভাকরের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমি অধিক মূল্য দিব।"

মির্জা দাউদ বলিলেন, "অধিক মূল্য দিলেও পাইবে না—এ মলমল এখন আমার।"

ডা-গামা সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া প্রভাকরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আমি দ্বিগুণ মূল্য দিব।"

মির্জা দাউদ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "শতগুণ দিলেও আর পাইবে না।"

ডা-গামা বিদ্যুৎবেগে মির্জা দাউদের দিকে ফিরিল। কর্কশকণ্ঠে কহিল, "মূর, চুপ কর্—আমি মালের মালিকের সহিত কথা কহিতেছি।"

প্রভাকর বুদ্ধিমান, মির্জা দাউদ তাহার পুরাতন খরিদ্দার, অথচ এই ব্যক্তিকে সে চেনেও না। সে বলিল, "উনিই এখন মালের মালিক, আমি কেহ নই। উনি যদি আপনাকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন।"

ডা-গামার অশিষ্ট কথায় কিন্তু মির্জা দাউদের মুখ ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, "ডা-গামা, পূর্ব্বেও বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু আজ তোর প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িল। ব্যবসায় তোর ভাণ মাত্র, তুই তস্কর। নচেৎ অনুচিত মূল্য দিয়া বাণিজ্য নষ্ট করিবি কেন?"

আহত ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা নিজ কটি হইতে তরবারি বাহির করিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া ক্রোধকষায়িত নেত্রে কহিল, "স্পর্ধিত মূর, আজ তোর রক্তে তরবারির কলঙ্ক ধৌত করিব।"

মির্জা দাউদও তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া কহিলেন, "বর্ব্বর ফিরিঙ্গী, আজ তোকে জাহান্নমে পাঠাইব।"

মুহূর্তমধ্যে ব্যগ্র জনতা চতুর্দিকে সরিয়া গিয়া মধ্যে বৃত্তাকৃতি স্থান যুযুৎসুদের জন্য ছাড়িয়া দিল। শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হইলেও এরূপ ব্যাপার কালিকটে একান্ত বিরল নহে। কলহ যখন তরবারি পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তখন তাহা ভঞ্জন করিবার প্রয়াস যে শুধু নিস্ফল নহে, অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। তাই সকলে সরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ত্রদ্বারা উভয় পক্ষকে বিবাদের মীমাংসা করিবার সুবিধা করিয়া দিল।

ভাস্কো-ডা-গামা ও মির্জা দাউদ প্রথম দৃষ্টিবিনিময়েই পরস্পরকে যে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সেই বিষ উভয়ের অন্তরে সঞ্চিত হইয়া আজ সামান্য সূত্র ধরিয়া দুর্নিবার বিরোধরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এ কলহ যে একজন না মরিলে নিবৃত্ত হইবে না, তাহা উভয়েই মনে মনে বুঝিলেন।

নিস্তব্ধ জনতার কেন্দ্রস্থলে অসিধারী দুই জন দাঁড়াইলেন। ভাস্কো-ডা-গামা বিশালকায়, প্রস্তরের মতো কঠিন, হস্তীর মতো বলশালী। মির্জা দাউদ অপেক্ষাকৃত কৃশ ও খর্ব ; কিন্তু বিষধর কালসর্পের মতো

ক্ষিপ্র, তেজস্বী ও প্রাণসার। ভাস্কো-ডা-গামার তরবারি বেত্রবৎ ঋজু, তীক্ষ্ণাগ্র; মির্জা দাউদের তরবারি ঈষৎ বক্র ও ক্ষুরধার। নগ্ন কৃপাণ-হস্তে ক্ষণকালের জন্য দুইজন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। তারপর ঝড়ের মতো তরবারিকে অগ্রবর্তী করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা আক্রমণ করিল।

কিন্তু ডা-গামার তরবারি মির্জা দাউদের অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্বেই তিনি ক্ষিপ্রহস্তে নিজ তরবারি দ্বারা তাহা অপসারিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরক্ষণেই তাঁহার বক্র অসি বিদ্যুতের মতো একবার ডা-গামার জানু দংশন করিয়া ফিরিয়া আসিল। ডা-গামা পিছু হটিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার জানুর চর্মাবরণ ধীরে ধীরে রক্তে ভিজিয়া উঠিল।

ডা-গামা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না; কিন্তু সাবধান হইল। সংযত ও সতর্কভাবে অসিচালনা করিতে লাগিল। সে বুঝিল যে, বিপক্ষকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। মির্জা দাউদের অসি-কৌশল অসাধারণ, তাঁহার সম্মুখে দ্বিতীয়বার ভুল করিলে আর তাহা সংশোধনের অবকাশ থাকিবে না।

এদিকে মির্জা দাউদও বুঝিলেন যে ডা-গামা অসি-কৌশলে তাঁহার সমতুল্য—কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা দ্বিগুণ বলশালী। আবার সে তাঁহার মতো ক্ষিপ্রগামী ও লঘুদেহ নহে বটে, কিন্তু তাহার তরবারি ঋজু এবং দীর্ঘ—মির্জা দাউদের তরবারি বক্র এবং খর্ব। তাঁহাদের যুদ্ধরীতিও সম্পূর্ণ পৃথক। এ ক্ষেত্রে, মির্জা দাউদ দেখিলেন, ডা-গামার জয়ের সম্ভাবনাই অধিক। মির্জা দাউদ অত্যন্ত সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সর্প এবং নকুলের যুদ্ধে যেমন উভয়ে উভয়ের চক্ষুতে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া

পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে এবং সুযোগ পাইবামাত্র তীরবেগে আক্রমণ করিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসে, ডা-গামা ও মির্জা দাউদও সেইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিরুদ্ধ হইয়া মুহুর্মুহুঃ ঝনৎকার উঠিতে লাগিল, চঞ্চল অসিফলকে সূর্যকিরণ পড়িয়া তড়িৎরেখার মতো জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। নিস্পন্দ জনব্যূহ সহস্রচক্ষু হইয়া এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে মির্জা দাউদ বাক্যশূলে ডা-গামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, "ফিরিঙ্গী দস্যু, চাহিয়া দেখ্, তোর রক্ত মানুষের রক্তের মতো লাল নয়, শয়তানের রক্তের মতো নীল! খৃস্টান কুত্তা, এখনও ক্ষমা প্রার্থনা কর্—তোর প্রাণ ভিক্ষা দিব!"

ডা-গামা কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শ্লেষ করিয়া মির্জা দাউদ যে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, চতুর ডা-গামা তাহা বুঝিয়াছিল।

যুদ্ধ ক্রমে আরও প্রখর ও তীব্র হইয়া উঠিল। দুই যোদ্ধারই ঘন ঘন শ্বাস বহিল। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতে লাগিল; কিন্তু উভয়েই যেন এক অদৃশ্য বর্মে আচ্ছাদিত। ডা-গামার তরবারি বার বার মির্জা দাউদের কণ্ঠের নিকট হইতে, বক্ষের নিকট হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল, মির্জা দাউদের অসি ডা-গামাকে ঘিরিয়া এক ঝাঁক ক্রুদ্ধ মৌমাছির মতো গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও হুল ফুটাইতে পারিল না।

সহসা এক সময় ডা-গামা সভয়ে দেখিল যে সে ঘুরিতে ঘুরিতে একবারে ঘাটের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর এক পা পিছাইলেই সমুদ্রের জলে পড়িয়া যাইবে। মির্জা দাউদ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বিদ্রূপ-বিষাক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ফিরিঙ্গী,

আজ তোকে ঐ সমুদ্রের জলে চুবাইব। তারপর মরা ইঁদুরের মতো তোর রাজা ইম্যাহুয়েলের কাছে তোকে বখশিস্ পাঠাইয়া দিব।"

এতক্ষণে মির্জা দাউদ যাহা চাহিতেছিলেন তাহাই হইল—ভাস্কো-ডা-গামা ধৈর্য হারাইল। উন্মত্ত বন্যমহিষের মতো গর্জন করিয়া অসি ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া সে মির্জা দাউদকে আক্রমণ করিল। ইচ্ছা করিলে মির্জা দাউদ অনায়াসে ডা-গামাকে বধ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি তরবারির উল্টা পিঠ দিয়া ডা-গামার দক্ষিণ মুষ্টিতে দারুণ আঘাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার তরবারি হস্তমুক্ত হইয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে গিয়া পড়িল। অকস্মাৎ অস্ত্রহীন হইয়া ডা-গামা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ডা-গামার দুই জন সহচর এতক্ষণ সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিল। প্রভুর অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে তাহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইবার পূর্বেই, অতি বিশাল-কলেবর নিকষকৃষ্ণ হাবসী জাম্বো মাস্তুলের ন্যায় দুই হস্ত বাহির করিয়া তাহাদের কেশ ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল এবং নিরতিশয় শুভ্র দুই পাটি দন্ত বিনিষ্ক্রান্ত করিয়া যাহা বলিল, তাহার একটি বর্ণও তাহারা বুঝিতে না পারিলেও জাম্বোর মনোগত অভিপ্রায় অনুধাবন করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র ক্লেশ হইল না।

মির্জা দাউদ তরবারির ধার ডা-গামার কণ্ঠে স্থাপন করিয়া কহিলেন, "ডা-গামা, নতজানু হ, নহিলে তোকে বধ করিব।"

ডা-গামা নতজানু হইল না—বাহুদ্বয়ে বক্ষ নিবদ্ধ করিয়া বিকৃতমুখে হাস্য করিয়া কহিল, "মূর, নিরস্ত্রকে হত্যা করা তোদের স্বভাব বটে।"

মির্জা দাউদ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ভালো, তোকে ছাড়িয়া দিব—কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর্—"

ডা-গামা কহিল, "আমি কোন প্রতিজ্ঞা করিব না, তোর যাহা ইচ্ছা কর্।"

মির্জা দাউদ বলিলেন, "শপথ কর্ যে, আজ হইতে সপ্তাহ মধ্যে সদলবলে এ দেশ ছাড়িয়া যাইবি, আর কখনও ফিরিবি না।"

ডা-গামা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, "মূর, তুই অতি নির্বোধ, আমি শপথ করিব না, আমাকে বধ কর্। আমার রক্তে কালিকটের মাটি ভিজিলে হিন্দে ইম্যান্থয়েলের জয়ধ্বজা সহজে রোপিত হইবে।"

মির্জা দাউদ হাস্য করিয়া কহিলেন, "এতদিনে নিজ মুখে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলি; কিন্তু তাহা হইতে দিব না। ইম্যান্থয়েলের জয়ধ্বজা কালিকটে রোপিত হইবে না। কালিকট চিরদিন পৃথিবীর সমস্ত জাতির মিলনক্ষেত্র হইয়া থাকিবে। প্রতিজ্ঞা কর, নচেৎ—"

ডা-গামা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "নচেৎ?"

"নচেৎ পোর্তুগালে ফিরিয়া যাইতে একটি প্রাণীও জীবিত রাখিব না। তোদের জাহাজ পুড়াইয়া এই একশত ত্রিশ জন লোককে কাটিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিব।"

ডা-গামা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না।

মির্জা দাউদ পুনশ্চ কহিলেন, "ডা-গামা, এখনও শপথ কর্—তোর ধর্মের উপর বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিব।—ভাবিয়া দেখ্, তোরা মরিলে কে তোর দেশবাসী ভিক্ষুকদের পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে?"

ডা-গামা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "শপথ করিতেছি—"

মির্জা দাউদ কহিলেন, "তোদের যেশুর জননী মেরীর নামে শপথ কর্।"

ডা-গামা তখন কম্পিত ক্রোধ-জর্জরিত কণ্ঠে শপথ করিল যে সপ্তাহ

মধ্যে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং আর কখনও ভারতভূমির উপর পদার্পণ করিবে না।

ডা-গামাকে ছাড়িয়া দিয়া মির্জা দাউদ ও আরও প্রধান প্রধান নাগরিকগণ সামরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনিয়া সামরী কহিলেন, "যত দিন উহারা আমার রাজ্যের কোনও প্রকাশ্য অনিষ্ট না করিতেছে, তত দিন শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া আমি উহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে পারি না। তবে কেহ যদি তোমাদের ব্যক্তিগত অনিষ্ট করিয়া থাকে, তোমরা প্রতিশোধ লইতে পার, আমি বাধা দিব না।"

সকলে সামরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ইহারা অত্যন্ত কূটবুদ্ধি ও যুদ্ধনিপুণ, তাহাদের কামান, বন্দুক, গোলাগুলি আছে; সুযোগ পাইলেই তাহারা বাহুবলে এই সোনার রাজ্য অপূর্ব অমরাবতী গ্রাস করিবে।

সামরী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার সৈন্যবল নাই সত্য, কিন্তু এই সামরীবংশ পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া এই মসলন্দে রাজত্ব করিতেছে—কেহ তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করে নাই। আমার সিংহাসন সুশাসন ও জনপ্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহারা আমার কি করিতে পারে?"

সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

সপ্তাহ পরে স্বর্ণপত্রে লিখিত সামরার সন্ধিলিপি মস্তকে ধারণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা অনুচরসহ জাহাজে উঠিল।

মির্জা দাউদ বন্দর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ডা-গামা শপথ স্মরণ রাখিও।"

একটা ক্রূর হাস্য ডা-গামার মুখের উপর খেলিয়া গেল, মির্জা দাউদের

প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, "মির্জা দাউদ, আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।"

মির্জা দাউদ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সম্ভব নয়। আমি মুসলমান —বেহেস্তে যাইব।"

ডা-গামা দুই চক্ষুতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া কহিল, "ইহজন্মেই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।"

তারপর ধীরে ধীরে তাহার তিনটি জাহাজ বন্দরের বাহির হইয়া গেল।

চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই চারি বৎসরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা এই কাহিনীর অন্তর্গত না হইলেও সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট ত্যাগ করিবার দুই বৎসর পরে আবার পোর্তুগীজ জাহাজ ভারতবর্ষে আসিল। এবার পোর্তুগীজদের অধিনায়ক আল্‌ভারেজ কেব্‌লাব নামক একজন পাদ্রী এবং তাঁহার অধীনে নয়খানি জাহাজ। পাদ্রী আল্‌ভারেজ কালিকট বন্দরে প্রবেশ করিয়াই জাহাজ হইতে নগরের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ফলে বহু নাগরিকের প্রাণনাশ হইল, অনেকে আহত হইল এবং কয়েকটি অট্টালিকা চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে রাজা-প্রজার মনে ভীতি ও কর্তব্যজ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া পোর্তুগীজরা আবার ভারতভূমিতে পদার্পণ করিল। রাজা সামরী আগন্তুকদিগকে সম্মান দেখাইলেন ও তাহাদের বাসের জন্য নগরের বাহিরে ভূমিদান করিয়া কুঠি-নির্মাণের অনুমতি দিলেন; কিন্তু পোর্তুগীজদিগের এই অহেতুক জিঘাংসা ও নিষ্ঠুরতায় কালিকটের জনসাধারণের মন তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তারপর কলহ বাধিতে বিলম্ব হইল না। দাম্ভিক বিদেশীদের প্রতি যাহাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহারা ঝগড়া বাধাইয়া রক্তপাত করিতে লাগিল। পোর্তুগীজরাও জবাব দিল। ক্রমে ভিতরে বাহিরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। একদিন নাগরিকগণ পোর্তুগীজদিগের কুঠিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া সত্তর জন ফিরিঙ্গীকে হত্যা করিল। অবশিষ্ট পলাইয়া জাহাজে উঠিল এবং জাহাজ হইতে গোলা মারিয়া নগরের এক অংশে আগুন লাগাইয়া দিল। তার পর সেই যে তাহারা কালিকট ছাড়িয়া গেল, দুই বৎসরের মধ্যে আর ফিরিয়া আসিল না।

কালিকটের রাজা-প্রজা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—আপদ দূর হইয়াছে, আর ফিরিবে না।

শেষোক্ত ঘটনার বৎসরেক পরে মির্জা দাউদ স্ত্রী-কন্যা লইয়া তাঁহার জন্মভূমি মরক্কো দেশে গেলেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থানের পর বৃদ্ধ পিতাকে সঙ্গে লইয়া মক্কাশরীফ দর্শন করিলেন। তারপর তীর্থ-দর্শন শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া কালিকটে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন।

কথা ছিল, মক্কাশরীফ হইতে মির্জা দাউদ কালিকটে আসিবেন, তাঁহার পিতা মরক্কো দেশে ফিরিয়া যাইবেন; কিন্তু পিতা স্থবির ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—অধিক দিন পরমায়ু নাই। পুনরায় মরক্কো যাইবার সুযোগ হয়তো শীঘ্র হইবে না, ততদিন পিতা বাঁচিবেন কি না, এই সকল বিবেচনা করিয়া মির্জা দাউদ তাঁহাকে ছাড়িলেন না, নিজের সঙ্গে কালিকটে লইয়া চলিলেন। বৃদ্ধও ঈদের চাঁদের মতো সুন্দর ক্ষুদ্র নাতিনীটিকে দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন—তিনিও বিশেষ আপত্তি করিলেন না।

মক্কাশরীফ দর্শনের সময় কালিকটের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত মির্জা দাউদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, "আপনারাও

কালিকটে ফিরিতেছেন—আমার জাহাজেই চলুন।" তাঁহারা আনন্দিত হইয়া সপরিবারে মির্জা দাউদের জাহাজে আশ্রয় লইলেন।

মক্কা হইতে কালিকট তিন মাসের পথ। জাহাজ যথা সময়ে আরব উপকূল ছাড়িয়া লোহিত সাগর পার হইল। ক্রমে পারস্য উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভারত সমুদ্রে আসিয়া পড়িল।

মহাসাগরের বুকের উপর বায়ু-বর্তুলিত পালের ভরে মির্জা দাউদের তরণী দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। চারিদিকে অতল জল দুলিতেছে, ফুলিতেছে—লক্ষকোটিখণ্ডে বিচূর্ণিত দর্পণের মতো রবিকরে প্রতিফলিত হইতেছে। পূর্ণ দিগন্তরেখা অখণ্ডভাবে তরণীকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। কেবল বহুদূরে পূর্বচক্রবালে মেঘের মতো কচ্ছভূমির তটবনানী ঈষন্মাত্র দেখা যাইতেছে।

জাহাজে যে অভিজ্ঞ আড়কাঠি আছে, সে বলিয়াছে যে বায়ুর দিক এবং গতি পরিবর্তিত না হইলে অষ্টাহমধ্যে কালিকটে পৌছানো যাইবে। আশু যাত্রাশেষ কল্পনা করিয়া আরোহীরা সকলেই হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

সেদিন শুক্রবার, সূর্য ক্রমে মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে চলিয়া পড়িল। জাহাজের বিস্তৃত ছাদের উপর মির্জা দাউদ, তাঁহার পিতা ও আর আর পুরুষগণ দ্বিপ্রাহরিক নামাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন। জাহাজের নিয়ামক সম্মুখে স্থিরদৃষ্টি করিয়া হালের নিকট নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু তরণীর বেগবিদীর্ণ জলরাশি ফেন-হাস্যে কলকল্ শব্দ করিতেছে।

এমন সময় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া মেঘগর্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দে সকলে চমকিত হইয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে পাঁচখানা ফিরিঙ্গী জাহাজ সমস্ত পাল তুলিয়া দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অগণ্য দাঁড় বাহিয়া যেন বহুপদবিশিষ্ট অতিকায় জলজন্তুর মতো ছুটিয়া আসিতেছে। অতর্কিতে

এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে যে, জাহাজের মানুষগুলাকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই আকস্মিক দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো সেই দিকে নিষ্পলকভাবে তাকাইয়া রহিলেন।

বিস্মিত হইবার মতো দৃশ্য বটে! দুই দণ্ড পূর্বেও চতুর্দিকে কোথাও একটা ভেলা পর্যন্ত ছিল না। সহসা সমুদ্রের কোন্ অতল গুহা হইতে এই পাঁচটা ভীষণ দৈত্য বাহির হইয়া আসিল? মির্জা দাউদের মন বলিল, আজ আর রক্ষা নাই। কামান দাগিয়া ইহারা নিজ আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়াছে—আজ তাহারা দয়ামায়া দেখাইবে না। মূরের রক্তে হিংসা চরিতার্থ করিবার আজ তাহাদের সুযোগ মিলিয়াছে।

এরূপ ঘটনা প্রতীচ্যখণ্ডের সমুদ্রবক্ষে পূর্বে কখনও ঘটে নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে এই পথে শত শত তরণী অবাধে যাতায়াত করিয়াছে। চীন হইতে কাস্পীয় হ্রদ পর্যন্ত কেহ কখন হিংস্রিকা বা বোম্বেটের নাম পর্যন্ত শুনে নাই। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথ অধিক নিরাপদ ছিল বলিয়াই জলবাণিজ্য এত প্রসার লাভ করিয়াছিল; কিন্তু আজ যুগযুগান্তরের বাহিতপণ্য অব্যাহত পথে স্বার্থান্ধ ফিরিঙ্গী তাহার অগ্নি-অস্ত্র লইয়া পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু যুদ্ধদান করা মির্জা দাউদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার জাহাজ তীর্থযাত্রীর জাহাজ, তাহাতে বারুদ-গোলা কিছুই নাই। আছে কেবল কতকগুলি অসহায় যুদ্ধানভিজ্ঞ ধর্মপরায়ণ তীর্থযাত্রী এবং তদপেক্ষাও অসহায় কতকগুলি নারী ও শিশু। এরূপ অবস্থায় পাঁচখানা রণপোতের সঙ্গে যুদ্ধ করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক উপায় পলায়ন; কিন্তু মির্জা দাউদের জাহাজ কেবল পালের ভরে চলে—বিপক্ষের পাল দাঁড় দুই আছে; এ ক্ষেত্রে পলায়নও সাধ্যাতীত।

মির্জা দাউদ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে চিন্তা করিলেন। একবার আকাশের

দিকে দৃষ্টি করিলেন। আকাশ নির্মেঘ—বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। রাত্রি হইতে বিলম্ব আছে। তিনি নাবিককে ডাকিয়া সমস্ত পাল তুলিয়া প্রাণপণে জাহাজ ছুটাইতে আজ্ঞা দিলেন।

কিন্তু এই আজ্ঞা পালিত হইতে না হইতে জলদস্যুদিগের পাঁচখানা জাহাজ হইতে একসঙ্গে কামান ডাকিল। একটা গোলা বড় পালের ভিতর ছিদ্র করিয়া জাহাজের পরপারে গিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল, অন্যগুলা জাহাজের চারিদিকে জলের উপর পড়িল। কোনটাই কিন্তু জাহাজকে গুরুতর জখম করিতে পারিল না।

জাহাজের পুরুষযাত্রিদের মুখ শুকাইল। নিম্ন হইতে ভীত শিশু ও নারীগণের আর্তনাদ ও ক্রন্দন উঠিল। দন্তে দন্তে চাপিয়া মির্জা দাউদ নাবিকদের হুকুম দিলেন, "যতক্ষণ পার, জাহাজ চালাও, ফিরিঙ্গী দস্যুর হাতে ধরা দিব না।"

এমন সময় মির্জা দাউদের চারি বৎসরের কন্যা হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিয়া আসিয়া পিতার জানু জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "বাবা, মা তোমাকে ডাকৃছেন।"—বলিয়া পিতার মুখের দিকে চোখ তুলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "বাবা, আমার বড় ভয় করছে।"

মির্জা দাউদ কন্যাকে দুই হাতে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার কানে কানে কহিলেন, "হারুনা, কাঁদিস্ না। তুই মুরের কন্যা—তোর কিসের ভয়? আজ আমরা সকলে একসঙ্গে বেহেস্তে যাইব।"

কন্যাকে পিতার ক্রোড়ে দিয়া মির্জা দাউদ নিচে নামিয়া গেলেন। সম্মুখেই আকুল-নয়না স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

নিজ কটি হইতে ক্ষুদ্র মাণিক্যখচিত ছুরিকা পত্নীর হস্তে দিয়া সংযত কণ্ঠে কহিলেন, "শালেহা, বোধ হয় আজ অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। বোম্বেটে জাহাজ পিছু লইয়াছে। যদি উহারা এ জাহাজে পদার্পণ করে,

হইতে এক জন পুরুষ উপরে উঠিয়া আসিল। অতি মহার্ঘ বেশভূষায় সজ্জিত বিশালদেহ এক পুরুষ। তাহাকে দেখিয়া মির্জা দাউদের বুকের রক্ত সহসা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। চিনিলেন—ভাস্কো-ডা-গামা। তাহার মুখের উপর কৃষ্ণ কাল-সর্পের মতো সিংহ যেন কুণ্ডলিত হইয়া আছে। মির্জা দাউদকে দেখিয়া ভাস্কো-ডা-গামা হাসিল। মাথার কঙ্কপত্রযুক্ত টুপি খুলিয়া তাহা আভূমি সঞ্চারিত করিয়া বলিল, "মির্জা দাউদ, আজ সুপ্রভাত! স্মরণ আছে, বলিয়াছিলাম আবার দেখা হইবে?"

মির্জা দাউদের মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। ভাস্কো-ডা-গামা তখন পূর্বোক্ত প্রধান নাবিকের দিকে ফিরিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, "কাপ্তেন, কামান নীরব কেন? আমার হুকুম কি ভুলিয়া গিয়াছ?"

ভীত কাপ্তেন বলিল, "প্রভু উহারা ধনরত্ন দিয়া পরিত্রাণের আর্জি করিতেছে।"

দুই জাহাজ ক্রমে আরও নিকটবর্তী হইতেছিল। ডা-গামা আবার মির্জা দাউদের দিকে ফিরিয়া শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "মূর, ধনরত্ন দিয়া প্রাণভিক্ষা চাও?"

মির্জা দাউদ কহিলেন, নিজের প্রাণভিক্ষা চাহি না। আমাদের সর্বস্ব লইয়া বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ছাড়িয়া দাও।"

ডা-গামা শত্রুর লাঞ্ছনার মিষ্ট রস অল্প অল্প করিয়া পান করিতে লাগিল, কহিল, "বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ছাড়িয়া দিব? কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ? বরঞ্চ তোমরা যুবতী নারীদের আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া পুরুষগণ প্রাণ বাঁচাইতে পার। আমাদের জাহাজে স্ত্রীলোকের কিছু প্রয়োজন হইয়াছে। আমার নিজের জন্য নয়—খালাসিদের জন্য। আমার নারীতে রুচি নাই।"

ক্রোধে অপমানে মির্জা দাউদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

বুঝিলেন, ডা-গামা তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতেছে। অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া কহিলেন, "ডা-গামা, তোমার প্রস্তাবের উত্তর দিতে ঘৃণা হইতেছে। যদি অভিরুচি হয়, আমাদের সহিত যাহা মূল্যবান সামগ্রী ও স্বর্ণ রৌপ্য আছে, তাহা লইয়া আমাদের নিষ্কৃতি দাও। নতুবা কিছুই পাইবে না।"

ডা-গামা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "কিছুই পাইব না, তার অর্থ ?"

মির্জা দাউদ কহিলেন, "তার অর্থ—জোর করিলে আমাদের মারিয়া ফেলিতে পারিবে, কিন্তু কিছু লাভ করিতে পারিবে না। যদি আমার জাহাজে চড়াও করিবার চেষ্টা কর, তক্তা খুলিয়া জাহাজ ডুবাইয়া দিব।"

মির্জা দাউদের কথা শুনিয়া ডা-গামার ভ্রূকুটি গভীরতর হইল, সে নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিল।

এদিকে জাহাজের মাস্তুল ভাঙিয়া যাওয়ায় মির্জা দাউদ পঙ্কে নিবদ্ধ হস্তীর মতো চলচ্ছক্তিহীন। ফিরিঙ্গীর পাঁচখানা জাহাজ ধীরে ধীরে তিন দিক হইতে ঘিরিয়া আরও নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

মির্জা দাউদ অধীর হইয়া কহিলেন, "ডা-গামা, যাহা করিবে, শীঘ্র কর। আমাদের সহিত বারশত তোলা সোনা আছে—আরও অন্যান্য মহার্ঘ বস্তু আছে; যদি পাইতে ইচ্ছা কর, শীঘ্র বল। অধিক বিলম্ব করিলে সব হারাইবে।"

ডা-গামা বলিল, "রমণীদের দিবে না ?"

মির্জা দাউদ গর্জিয়া উঠিলেন, "না, দিব না। আমরা স্ত্রী-কন্যার ব্যবসা করি না।"

ডা-গামা কহিল, "মূর, এখনও তোর স্পর্ধা কমিল না!—ভালো

অর্থই লইব। তোমার জাহাজে যাহা কিছু আছে, ভেলায় করিয়া আমার জাহাজে পাঠাও।”

“যাহা কিছু আছে, পাইলে ছাড়িয়া দিবে?”

“দিব।”

“তোমাকে বিশ্বাস কি?”

“আমি মিথ্যা কথা বলি না।”

“মিথ্যাচারী, শপথ করিয়াছিলে কথনও হিন্দে পদার্পণ করিবে না, তাহার কি হইল?”

ডা-গামা, হাসিয়া বলিল, এখনও হিন্দে পদার্পণ করি নাই।”

মির্জা দাউদ তখন অন্যান্য সকলের সহিত পরামর্শ করিলেন। সকলেই কহিলেন, উহাদের কবলে যখন পড়িয়াছি, তখন উহাদের কথায় বিশ্বাস করা ভিন্ন উপায় নাই। অগত্যা মির্জা দাউদ সম্মত হইলেন।

তখন এক ভেলা প্রস্তুত করিয়া তাহারই উপর যাহা কিছু ছিল, এমন কি, নারীগণের অলঙ্কার পর্য্যন্ত তুলিয়া ডা-গামার জাহাজে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

ডা-গামা জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের আর কিছু নাই?”

“না।”

“আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—নারীদের দিবে না?”

অসহ্য ক্রোধে মির্জা দাউদের বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল। শুধু তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতে লাগিল।

ভাস্কো-ডা-গামা কালকূটের মতো হাসিল। বলিল, “ভালো, তোমাদের যেরূপ অভিরুচি।” তারপর কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া

বলিল, "কাপ্তেন, গোলা মারিয়া উহাদের জাহাজে আগুন লাগাইয়া দাও। আজ মুসলমান কুকুরগুলাকে পুড়াইয়া মারিব।"

মির্জা দাউদ চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "শঠ! বিশ্বাসঘাতক! মিথ্যাবাদী শয়তান!"

ডা-গামা কহিল, "মির্জা দাউদ, তোর প্রাণরক্ষা করিতে পারে, এত অর্থ পৃথিবীতে নাই। তবে তুই তোর স্ত্রীর বিনিময়ে এখনও প্রাণরক্ষা করিতে পারিস্। তোর স্ত্রীকে আমি বাঁদী করিয়া রাখিব।"

মির্জা দাউদ উন্মত্তের মতো গর্জন করিতে লাগিলেন, "শয়তান! শয়তান!"

জাহাজে ভীষণ কোলাহল উঠিল। নর-নারী সকলে পাগলের মতো চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সকলেই যেন এই অভিশপ্ত জাহাজ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। চতুর্দিক হইতে আর্তরব উঠিল, "রক্ষা কর! দয়া কর! প্রাণ বাঁচাও।"

এই আকুল প্রার্থনার জবাব আসিল। সহসা শিলাবৃষ্টির মতো জাহাজের উপর বন্দুকের গুলি পড়িতে লাগিল। কেহ হত, কেহ আহত হইয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যুর বিভীষিকা যেন ভীষণতর রূপ ধরিয়া দেখা দিল।

মির্জা দাউদের পিতা ক্ষুদ্র হারুণাকে বক্ষে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্খলিত কণ্ঠে একবার শুধু ডাকিলেন, "দাউদ!"

দুর্দম আবেগে মির্জা দাউদ এক সঙ্গে পিতা ও কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন, এমন সময় লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়া শালেহা আসিয়া স্বামীর হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

মির্জা দাউদ বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে একবার তিন জনের মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর অবরুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "পিতা, ঈশ্বর কি নাই?"

সহসা হারুণা ক্ষুদ্র একটি কাতরোক্তি করিয়া এলাইয়া পড়িল। দ্রুত কন্যাকে নিজের ক্রোড়ে লইয়া মির্জা দাউদ দেখিলেন, তাহার দেহে প্রাণ নাই। নিষ্ঠুর গুলি তাহার বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

তারপর দ্রুত অনুক্রমে স্ত্রী ও পিতা গুলির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গিয়া মরণ-যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতে লাগিলেন। ভাস্কো-ডা-গামা তখন স্বয়ং ধূমায়িত বন্দুক হাতে করিয়া পিশাচের মতো উচ্চ হাসি হাসিতেছে।

সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে। আকাশ এবং সমুদ্র তপ্ত রক্তের মতো রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সাগরবক্ষে সূর্যাস্ত হইতেছে।

এইবার পাঁচখানা জাহাজ হইতে এককালে কামান ডাকিল। গোলার সংঘাতে শীতার্ত বৃদ্ধের মতো মির্জা দাউদের জাহাজখানা কাঁপিয়া উঠিল। পালের কাপড়ে দপ করিয়া আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে জাহাজ নিমজ্জিত হইতে লাগিল। আবার কামান গর্জিল। এবার জাহাজের সম্মুখ দিকটা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কল্‌কল্‌ শব্দে জল ঢুকিতে লাগিল।

তারপর নিমেষের মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। আরোহীদের মিলিত কণ্ঠ হইতে এক মহা হাহাকার-ধ্বনি উঠিল। জ্বলন্ত জাহাজ অকস্মাৎ জীবিতবৎ সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল; তারপর সবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। যাত্রীদের উর্ধ্বোত্থিত কণ্ঠস্বর সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। মুহূর্তপূর্বে যেখানে জাহাজ ছিল, সেখানে আবর্তিত তরঙ্গশীর্ষ জলরাশি ক্রীড়া করিতে লাগিল।

ফিরিঙ্গী-জাহাজগুলি চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায়ান্ধকারে তাহাদিগকে যেন অন্য জগতের কোন ভৌতিক তরণীর মতো দেখাইতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে সান্ধ্য নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ হইতে দামামা ও তূর্য বাজিয়া উঠিল।

সূর্য তখন সমুদ্রপারে অস্তমিত হইয়া অন্য কোন্ নূতন গগনে উদিত হইয়াছে।

মরণ-ভোমরা

বড়দিনের ছুটি শেষ হইতে আর দেরি নাই। গত কয় দিন হইতে পশ্চিমা বাতাস দিয়া দুর্জয় শীত পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আমরা মাত্র তিনজন ক্লাবের সভ্য চারিদিকের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া চিম্‌নির গন্‌গনে আগুনের সম্মুখে বসিয়াছিলাম। বাহিরের আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ও প্রবল বায়ু মিলিয়া একটা দুর্যোগ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল।

অমূল্য বলিল, "আজ আর কেউ আসছে না, চলো বাড়ি ফেরা যাক্। তিন জনে ভূতের মতো বসে থেকে কোনও লাভ নেই—চার জন হ'লেও না হয় বৃজ্‌ খেলা যেত।"

বরদা স্তিমিতনেত্রে আগুনের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল, কতকটা যেন অন্যমনস্কভাবেই বলিল, "সেবারে এই ডিসেম্বর মাসে কসৌলী গিয়েছিলুম—বাপ! কি শীত! মাথার ঘিলু পর্যন্ত জমে যাবার উপক্রম। পালিয়েই আসতুম্—যদি না একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে সব ওলট্‌-পালট্‌ করে দিত।—আচ্ছা, কত বড় গঙ্গাফড়িং তোমরা দেখেছ বলো দেখি?"

অমূল্য বলিল, "হুঁ, আষাঢ়ে গল্প ফাঁদবার মতলব। ওসব চালাকি চলবে না বরদা, আমি উঠলুম্।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কসৌলী গিয়েছিলে কেন?"

বরদা বলিল, "কুকুরে কামড়েছিল; সেই কথাই তো—"

অমূল্য বলিল, "জানি, সে বিষ এখনও তোমার শরীর থেকে বেরোয় নি। আমি আর এখানে থাক্‌ছি না, তোমার গঙ্গাফড়িং নিয়ে তুমি থাকো।"

অমূল্য উঠিয়া পড়িল, শালখানা ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া ঘোমটার মতো করিয়া মাথায় দিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বার বন্ধ ছিল, ঠেলা দিয়া খুলিয়াই অমূল্য চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "কে রে!"

"মশায়, আসতে পারি কি?"

অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া দেখিলাম, ওভারকোট ও মাঙ্কি ক্যাপে সর্ব অবয়ব আচ্ছন্ন করিয়া একটি লোক দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। মুখচোখ কিছুই দেখা গেল না, শুধু ব্যালাক্লাভা ও ওভারকোটের কলারের অন্তরালে একজোড়া কালো গোঁফের আভাস পাওয়া গেল মাত্র।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান?"

লোকটি বলিল, "এইটি কি বাঙালীদের ক্লাব?"

বরদা আহ্বান করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আসুন, ভেতরে এসে বসুন। অমূল্য, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসো হে, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।"

লোকটি ঘরে আসিয়া প্রথমে মাঙ্কি ক্যাপ ও পরে ওভারকোট খুলিয়া চেয়ারের পিঠের উপর রাখিল, তখন প্রকাণ্ড খোলের ভিতর হইতে অতি ক্ষুদ্র শামুকের মতো তাহার চেহারাখানা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মানুষ যে এত শীর্ণ হইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা এই লোকটিকে না দেখিয়া ধারণা করা কঠিন। বয়স বোধ করি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি ও মানসিক দুশ্চিন্তা তাহার নিরতিশয় ক্ষীণ শরীরটির প্রত্যেক অবয়বে যেন জরার ছাপ মারিয়া দিয়াছে। মাংসহীন মুখের উপর ঘনকৃষ্ণ একজোড়া গোঁফ মুখখানাকে আরও শুষ্ক শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছে। কপালে গভীর কালো রেখা—মুখের রং ফ্যাকাশে পীতবর্ণ। মাথার দুই পাশে বড় বড় একজোড়া কান যেন পাখা মেলিয়া উড়িবার উপক্রম করিতেছে। তাহার মুখের সমস্ত প্রত্যঙ্গই মৃত বলিয়া মনে হয়—কেবল কালিমাবেষ্টিত বড় বড় দুইটা চক্ষু যেন দেহের শেষ প্রাণশক্তিটুকু হরণ করিয়া জ্বল্‌-জ্বল্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

অজীর্ণ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির তাড়নায় যাঁহারা শীতকালে সুজলা বাংলাদেশের মায়া কাটাইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে এই ধরণের চেহারা দুই একটা যে দেখি নাই এমন নয়। বুঝিলাম, ইনিও একজন স্বাস্থ্যান্বেষী বায়ুভুক্ জীব। মনে মনে ভাবিলাম, কেবলমাত্র মুঙ্গেরের জলহাওয়া এই কংকালে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে কি? ঘোর সন্দেহ হইল।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ক্লাবের কোন সভ্যকে খুঁজছেন?"

লোকটি একবার আমাদের তিন জনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার গোঁফ-জোড়া নড়িয়া উঠিল। তারপর অদ্ভুত রকমের একটা হাসি হাসিয়া বলিল, "তা হ'তেও পারে, এখনও ঠিক বলতে পারছি না।"

আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম। লোকটি পুনশ্চ বলিল, "আমি এ সহরে নবাগত। আজ তিনদিন হ'ল এসেছি—ডাকবাংলোয় আছি; কিন্তু এ ক'দিন বাঙালীর সঙ্গে কথা না কয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি, মশায়। আজ সন্ধ্যেবেলা বেয়ারার কাছে খবর পেলুম, এখানে বাঙালীদের একটা ক্লাব আছে, তাই খোঁজ করতে করতে এসে হাজির হয়েছি। আর থাকতে পারলুম না।"

আমি বলিলাম, "বেশ করেছেন। যতদিন থাকেন, নিয়মিত আসবেন, আমরা খুব খুশী হব। তা—স্বাস্থ্য উপলক্ষে এখানে আসা হয়েছে বুঝি!"

লোকটি বলিল, "না, স্বাস্থ্য তো আমার বেশ ভালোই।"—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটা তুলিয়া বলিল, "সে জন্যে নয়, মশায়; মৃত্যু আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই ভারতবর্ষময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি; কিন্তু রেহাই নেই। যেখানেই

যাই, মৃত্যু আমার পেছনে লেগে আছে। মনে ভাবি, আর বাঙালীর সঙ্গে দেখা করব না ; কিন্তু পারি না, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।"

কথাটা খাপছাড়া ঠেকিল, কিন্তু তবু মৃত্যু যে তাহাকে তাড়া করিয়াছে এবং অচিরাৎ ধরিয়া ফেলিবে, সে বিষয়ে অন্ততঃ আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। তথাপি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "এখানকার জলহাওয়া খুব ভালো, কিছু দিন থাকুন, নিশ্চয় সেরে উঠবেন।"

লোকটি পকেট হইতে চামড়ার সিগার-কেস্ বাহির করিয়া বলিল, "ধূমযাত্রা করেন কি ?"—বলিয়া তিনটি ভীষণদর্শন সিগার আমাদের তিন জনকে দিয়া একটি নিজে ধরাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল। আমরা নির্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। এই শরীরের উপর এইরূপ বিকটাকৃতি বিষাক্ত কড়া সিগার টানিয়া লোকটা কয় দিন বাঁচিবে ?

আমাদের মুখের প্রতি কিন্তু তাহার নজর ছিল, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আপনারা ভুল করছেন। আমি দেখতে একটু রোগা বটে, কিন্তু আমার শরীরে কোনও রোগ নেই। ধরুণ তো আমার পাঞ্জা।"—এই বলিয়া কাঠির মতো অঙ্গুলিযুক্ত কংকালসার হাতখানা আমার দিকে বাড়াইয়া দিল।

পাগল নাকি ! আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না, না' সে কথা বলি নি। আমি বলছিলুম—"

"ধরুন পাঞ্জা—" লোকটার চক্ষু দুটা ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমরা মনে মনে প্রমাদ গণিলাম ; কোথা হইতে একটা উন্মাদ আসিয়া জুটিল ! আমরা পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিতেছি দেখিয়া লোকটা নাছোড়বান্দা হইয়া বলিল, "আপনারা ভাবছেন, রোগা বলে আমার

গায়ে জোর নেই। ভুল! ভুল! পাঞ্জায় গামা পালোয়ানও আমাকে হারাতে পারে না। ধরুন পাঞ্জা।"

কি করি, নিরুপায় হইয়াই তাহার পাঞ্জা ধরিলাম। নিজের দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে ভালো ধারণাই ছিল; ভয় হইল, বুঝি একটু চাপ দিলেই ঐ প্যাকাটির মতো আঙুলগুলা মট্‌-মট্‌ করিয়া ভাঙিয়া যাইবে; কিন্তু তাহার হাতে হাত দিয়াই বুঝিলাম, সে আশঙ্কা অমূলক। তাহার আঙুলগুলা ইস্পাতের তারের মতো আমার আঙুলগুলাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি যতই বলপ্রয়োগ করি, তাহার কব্জি ততই লোহার মতো শক্ত হইতে থাকে। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। চাহিয়া দেখিলাম, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ নির্বিকার, দাঁতে সিগার চাপিয়া স্বচ্ছন্দে ধূম উদ্গারণ করিতেছে।

ক্রমে আমার হাত অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। তারপর সবিস্ময়ে দেখিলাম, হাতখানা অজ্ঞাতসারে ঘুরিয়া যাইতেছে।

আমার কব্জির কাছে মট্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল। "ব্যাস্‌! কাবার!"—বলিয়া লোকটা পাঞ্জা ছাড়িয়া দিল। আমি স্তম্ভিতভাবে অবশ হাতখানা তুলিয়া বসিয়া রহিলাম।

খানিকক্ষণ কেহ কোনও কথা কহিল না, লোকটা অর্ধমুদিতনেত্রে সিগার টানিতে লাগিল।

অবশেষে অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়ের নামটি কি?"

সে বলিল, "ভূতনাথ শিকদার। দেখলেন তো যা বল্‌লুম সত্যি কি না? রোগ আমার শরীরে নেই মশায়, রোগ এইখানে।"—বলিয়া নিজের কপালে তর্জনী ঠেকাইল।

বরদা নিজের চেয়ারখানা ভূতনাথ শিকদারের পাশ হইতে একটু সরাইয়া লইয়া বলিল, "আপনি যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিলেন, তা

তো চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না ; ভোজবাজি বলে মনে হচ্ছে ; কিন্তু শরীর যদি আপনার নীরোগই হয়, তবে আপনি এত রোগা কেন? মাথার কি কোনও অসুখ আছে?”

ভূতনাথ শিকদার বলিল, “মাথার অসুখ নেই, অসুখ আমার কপালের, ভাগ্যের। বলছি তো, মৃত্যু আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে।”

বরদা বলিল, “কথাটা আর একটু খোলসা করে না বললে ঠিক বুঝতে পারছি না।”

শিকদার চুরুটে তিন চারটা টান দিয়া যেন কি চিন্তা করিল, শেষে বলিল, “আচ্ছা, বলছি, কিন্তু এ কথা শোনবার পর আর আপনারা আমার মুখদর্শন করতে চাইবেন না। এই ভয়েই তো দেশদেশান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—বাঙালীর ছায়া মাড়াতে চাই না ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি না। আপনারা আমায় মাফ করবেন, আমি একটা মহা অলক্ষণ, যাদের সঙ্গে মিশি, তাদেরই অমঙ্গল হয়।”

তাহার কথাগুলা এমন একটা অবসন্ন করুণ রেশ রাখিয়া গেল যে, কিছু না-বুঝিয়াও আমার হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। হয়তো লোকটি জীবনে অনেক দুঃখশোক পাইয়াছে, তাই মাথাটা কিছু খারাপ হইয়া গিয়াছে—মনে করে, যাহার সহিত কথা কহিবে তাহারই অমঙ্গল ঘটিবে। আমার এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসীমার এইরূপ হইয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে স্বামী, তিন পুত্র ও সাতটি নাতি-নাতনী হারাইয়া তিনি প্রায় পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, সর্বদা চোখে কাপড় বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন, বলিতেন—আমি কাহারও মুখ দেখিব না, আমার দৃষ্টি যাহার উপর পড়িবে, সে আর বাঁচিবে না। ভূতনাথ শিকদারেরও হয়তো সেই রকম কিছু হইয়া থাকিবে।

আমি বলিলাম, "তা হোক্, আপনি বলুন। ও সব অলক্ষণ-কুলক্ষণ আমরা মানি না।"

শিকদার বলিল, "আপনাদের তরুণ বয়স, ও সব না-মানাই স্বাভাবিক। ভূত-প্রেত, পরকাল, সূক্ষ্মদেহ এ সব আপনাদের মানতে বলছি না, কিন্তু আসন্ন দুর্ঘটনা যে আগে থাকতে মানুষের জীবনে ছায়াপাত করে, এ কথাও কি আপনারা স্বীকার করেন না?"

আমরা চুপ করিয়া রহিলাম। শিকদার বলিতে লাগিল, "তবে ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি। আমার জীবন কেন যে মনুষ্যসমাজ থেকে একটা ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা শুনলে আপনারা হয়তো আমাকে পাগল মনে করবেন; কিন্তু বাস্তবিক আমি পাগল নই, আপনাদের মতো সহজ মানুষ। পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে, হেসে-কেঁদে সাধারণ মানুষের মতো জীবন কাটাতে চাই; কিন্তু পারি না! কেন পারি না, জানেন? ভয়! দারুণ ভয়ে আমি কারুর সঙ্গে মিশতে পারি না। একটা মহা আতঙ্ক সব সময় আমাকে গ্রাস করে আছে। যখন একলা থাকি বেশ থাকি, কিন্তু আপনারাই বলুন তো, মানুষ একলা সঙ্গিহীনভাবে কত দিন থাকতে পারে? তাই মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়তে হয়।

"আমি বিবাহ করি নি, কেন করি নি তা সহজেই বুঝতে পারবেন। বাপ-মা অনেক দিন গত হয়েছেন, আত্মীয়স্বজনও এখন বড় কেউ নেই, চিৎপুর রোডে পৈতৃক বাড়িখানা এখনও বিক্রী করি নি, টাকাও যথেষ্ট আছে, কিন্তু তবু একটা সৃষ্টিছাড়া অন্ধকার ধূমকেতুর মতো কেবল শূন্যের মাঝখানে ছুটে বেড়াচ্ছি—কেন?

"যখন আমার ষোল বছর বয়স, তখন এক দিন গ্রীষ্মের দুপুরবেলায় তিনজন সমবয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে আমি আমাদের বাড়ির তে-তলায় একটা

ঘরে বসে তাস খেলছিলুম। সেই দিনটা হচ্ছে আমার জীবনের একটা অভিশাপ। স্কুলে গরমের ছুটি হয়ে গেছে, রোজই আমাদের এই রকম খেলা বসে। তে-তলার এই ঘরটি দিব্যি নিরিবিলি, চিৎপুর রোডের চিৎকার সেখান পর্যন্ত পৌছায় না, শুধু মাঝে মাঝে ট্রামের ঢং ঢং শব্দ শোনা যায়। সে দিন আমরা চারজন নিবিষ্টমনে বসে খেলছি, এমন সময় খোলা জানালা দিয়া একটা কালো ভোমরা ঘরে ঢুকে আমাদের ঘিরে ভন্‌ভন্‌ করে ঘুরতে লাগল। খেলায় এত তন্ময় ছিলুম যে প্রথমটা লক্ষ্যই করি নি, কিন্তু সেটা যখন মাথার চারিদিকে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করলে, তখন আমরা চারজনেই উঠে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম; কিন্তু সেও কিছুতেই যাবে না; পাখা দিয়ে—ব্যাড্‌মিণ্টনের ব্যাট্‌ দিয়ে যতই তাকে মারবার চেষ্টা করি, সেও ততই আমাদের লক্ষ্য এড়িয়ে কখনও নিচুতে, কখনও প্রায় কড়িকাঠের কাছে উঠে ঘুরতে থাকে। আমরা যেই আবার খেলতে বসি, অমনই আমাদের কানের কাছে এসে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে উড়তে আরম্ভ করে।

"প্রায় আধ ঘণ্টা তার পেছনে লেগে থাকবার পর যখন আমরা হয়রাণ হয়ে পড়েছি, তখন ভোমরাটা ভন্‌ন্‌ করে এসে একবার আমাদের মাথার চারিদিকে চক্র দিয়ে নিজে থেকেই জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরের তপ্ত বাতাসে তার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল।

"গোপাল বললে, 'দেখ ভাই, আশ্চর্য ভোমরা! একবার আমি ব্যাড্‌মিণ্টন ব্যাট্‌ দিয়ে মারলুম, ঠিক মনে হ'ল ভোমরাটা তাঁতের ভেতর দিয়ে গলে গেল।'

"বীরেন বললে, 'দূর! অত বড় ভোমরা কখনও অতটুকু ফাঁক দিয়ে গলতে পারে?'

"হরিপদ বললে, 'কিন্তু এই কলকাতা সহরে ভোমরা এলো কোত্থেকে, ভাই? কাছে-পিঠে কোথাও বাগানও তো নেই!'

"সত্যি তো, ভোমরা এলো কোত্থেকে? আমরা নানারকম আঁচ-আন্দাজ করতে লাগলুম, কিন্তু কোনটাই বেশ লাগসই হ'ল না। তখন আমাদের বয়স কম, ভোমরা কোথা থেকে এলো, এ সমস্যা নিয়ে বেশি মাথা ঘামালুম না; কিন্তু ভোমরাটাকে মন থেকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতেও পারলুম না।

"পরদিন দুপুরে গোপাল তাস খেলতে এলো না। তিন জনে খেলা ভালো জমল না, সারা দুপুর গল্প করে আর গোপালকে গালাগাল দিয়ে কাটিয়ে দিলুম।

"গোপাল গ্রে ষ্ট্রীটে থাকত। বিকেলবেলা তার বাড়ি গিয়ে দেখলুম, সে বিছানায় শুয়ে আছে, মাথায় বরফ দেওয়া হচ্ছে। আমায় দেখে চিনতে পারলে কি না বোঝা গেল না,—চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে লাল। শুধু একবার গেঙিয়ে গেঙিয়ে কি একটা কথা বললে—মনে হ'ল যেন বললে—ভোমরা!

"তার চারিদিকে ডাক্তার আর বাড়ির লোক ভিড় করেছিল; কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না, গোপালের কি হয়েছে। পরে শুনেছিলুম—সর্দিগর্মি। সান্-স্ট্রোক্।

"আমি চুপি চুপি চোরের মতো বাড়ি ফিরে এলুম; তার সেই অস্পষ্ট কথাটা আমার মাথার মধ্যে কেবলই গুমরে গুমরে উঠতে লাগল—ভোমরা! ভোমরা!

"পরদিন গোপাল মারা গেল। সেই থেকে, কি করে জানি না, আমার মনে গেঁথে গেল যে, সেই ভোমরাটা ছিল মৃত্যুর দূত। গোপালের দিন যে ফুরিয়ে এসেছে, এই খবরটা সে আমাদের দিতে এসেছিল।

"তারপর থেকে এই কুড়ি বছরের মধ্যে কতবার ভোমরা দেখেছি জানেন?—তিনশ' একুশবার। আর, একবারও আমার ভোমরা দেখা নিষ্ফল হয় নি!"

নির্বাপিত সিগারটা আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া শিকদার আর একটা সিগার ধরাইল। আমরা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

শিকদার বলিল, "প্রথম প্রথম মনে হ'ত, বুঝি আমার মনের ভুল; কিন্তু তা নয়—ভোমরাটাকে সকলেই দেখতে পায় এবং দেখার তিন দিনের মধ্যে যারা দেখেছে, তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু অনিবার্য। বাবা মারা যাবার আগে ভোমরা দেখলুম,—মার বেলাতেও দেখা পেলুম।

"ক্রমে মানুষের সঙ্গ আমার কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠল—সর্বদাই আতঙ্ক, কি জানি কখন ভোমরা দেখে ফেলি। হয়তো পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব মিলে গল্প করছি, হঠাৎ ভোমরা দেখা দিলেন। দুম করে বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ল। আমার এই সুস্থ সবল বন্ধুদের মধ্যে একজনের মেয়াদ ফুরিয়েছে—তিন দিনের মধ্যে তাঁকে যেতে হবে।

"একটা উৎকট কৌতূহল হ'ত; জানতে ইচ্ছে করত, এদের মধ্যে কাকে ভোমরা নোটিশ দিয়ে গেল। মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা করতুম—এবার কার পালা; কিন্তু আন্দাজ ঠিক হ'ত না। ভোমরার মৃত্যু-পরোয়ানার মধ্যে ঐটুকুই ছিল কৌতুক—কার ওপর সমন জারি করে গেল, শেষ পর্যন্ত বোঝা যেত না।

"একবারকার ঘটনা বলি। বর্ধমানে মামার বাড়ি গিয়েছি; মামার অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। পৌঁছনোর পরদিন সকালবেলা আমরা সকলে মিলে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় ভোমরার আবির্ভাব হ'ল। আমার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল। সুবী বলে মামার একটা বছর দশেকের মেয়ে দেয়ালের ধারে বসে চা তৈরি করছিল,

ভোমরাটা উড়তে উড়তে দেয়ালে ঠোকর খেয়ে টপ্ করে পড়ল একেবারে সুবীর মাথায়। সুবী হাঁউমাউ করে উঠে দাঁড়াতেই জ্বলন্ত স্টোভটা উল্টে গিয়ে তার কাপড়ে আগুন ধরে গেল। ভোমরা ভোঁ করে উড়ে পালাল।

"আমরা পাঁচজনে মিলে সুবীর কাপড়ের আগুন নেবালুম বটে, কিন্তু তার পা দুটো ঝল্‌সে সাদা হয়ে গেল। ডাক্তার এসে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে বলে গেলেন—সিরিয়াস্ কিছু নয়, খুব বেঁচে গেছে।

"আমি মনে মনে বললুম—বেঁচে মোটেই যায় নি,—এ ভোমরার নোটিশ, ব্যর্থ হবার নয়। ঘা থেকে সেপ্‌টিক্, তার পরেই সাফ।

"দুপুরবেলা সুবীর জ্বর এলো। সন্ধ্যের সময় আমি একটা ছুতো করে ঊর্ধ্বশ্বাসে বর্ধমান ছেড়ে পালালুম। সুবীটা বড় ভালো মেয়ে ছিল, মামাতো ভাইবোনের মধ্যে তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতুম্।

"বাড়ি ফিরে এসে কাউকে কিছু বললুম্ না। যথাসময় টেলিগ্রাম এলো—সুবীর কিছু হয় নি, মামা হঠাৎ হার্ট্ ফেল্ করে মারা গেছেন!

"ভোমরার অভিসন্ধি বোঝবার চেষ্টা করেছিলুম, তাই সে আমার সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করে গেল।

"আমার মনের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন,—সর্বদা যেন মৃত্যুর দূতকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি। অনেক ভেবে ভেবে একটা মতলব ঠিক করলুম,—দিনের বেলা যতদূর সম্ভব একলা থাকতুম, রাত্তিরে বাড়ি থেকে বার হতুম। মনের ভাবটা এই যে, রাত্তিরে তো আর ভোমরা আসতে পারবে না!

"কিন্তু আমার ফন্দি খাটল না। দিন-রাত্রি নির্বিচারে ভোমরা আসতে লাগল—রাত্তিরে কানামাছির মতো টাউরি খেতে খেতে আসে, আবার টাউরি খেতে খেতে চলে যায়।

"আমার মানসিক অবস্থা ক্রমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই জিজ্ঞাসা করে, "তুই অমন কুনো হয়ে যাচ্ছিস কেন? চেহারাটাও দিনদিন ভূতে-পাওয়া গোছের হয়ে যাচ্ছে। হয়েছে কি?"

"আমি চুপ করে থাকি—কি বলব? সত্যি কথা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারি না।

"অতঃপর বাবা-মা মারা যাবার পর থেকে এই নিরুদ্দেশ-যাত্রা সুরু হয়েছে। মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু মৃত্যু-দূত আমার সঙ্গ ছাড়ে না। এক এক সময় হাত জোড় করে ডাকি, 'মরণ-ভোমরা! তুমি এবার আমাকে নাও, এই দুঃসহ শাস্তি থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও।'—কিন্তু আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না। এ সংসারে কেবল আমিই যেন অমর, সকলের মৃত্যুর পরোয়ানা বয়ে বেড়াচ্ছি।"

শিকদারের কণ্ঠস্বর একটা গভীর নিরাশার মধ্যে মিলাইয়া গেল। তাহার কথাগুলা ঘরের মধ্যে যেন একটা অবাস্তব দুঃস্বপ্নের জাল বুনিয়া দিয়াছিল। আমরা আগুনের দিকে তাকাইয়া মোহাচ্ছন্নের মতো বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি শেষ কবে মরণ-ভোমরা দেখেছেন?"

শিকদার চোখের উপর দিয়া ডান হাতখানা একবার চালাইয়া বলিল, "সাত দিন আগে, আগ্রায়। তাজ দেখতে গিয়েছিলুম, সেখানে একটি বাঙালী দম্পতির সঙ্গে দেখা হ'ল। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে তাজ দেখতে এসেছে—ছেলেমানুষ, নবপ্রণয়ী। প্রণয়ের মহাতীর্থে নিজেদের সম্মিলিত ভালোবাসা বোধ হয় নিবেদন করতে এসেছিল। তার পর ..ভোমরা··· সেই রাত্রেই আগ্রা ছেড়ে চলে এলুম।"

চার জনেরই সিগার নিবিয়া গিয়াছিল, পুনশ্চ ধরাইয়া নিঃশব্দে টানিতে লাগিলাম।

মিনিট পনের সকলেই চুপচাপ।

হঠাৎ শিকদার বলিল, "একটু গরম বোধ হচ্ছে না? জানালাটা খুলে দিতে পারি?"

বদ্ধ ঘরে সিগারের কটু ধোঁয়া ও আগুনের উত্তাপে সত্যই দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিতেই শিকদার উঠিয়া পশ্চিমদিকের জানালাটা খুলিয়া দিল।

বরদা আমার কানে কানে বলিল, "একেবারে বদ্ধ পাগল— মনোম্যানিয়াক্। ওর চোখের চাউনি দেখছ?"

শিকদার জানালা খুলিয়া দিতেই একটা এলোমেলো কন্‌কনে হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাদের উত্তপ্ত মুখের উপর যেন ঠাণ্ডা হাত বুলাইয়া দিল। টেবিলের উপর আলোটা নিব-নিব হইয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল।

শিকদার ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়াছে, এমন সময়—

ভন্‌ন্‌—

ও কিসের শব্দ? চারি জনেই চেয়ারের উপর সোজা শক্ত হইয়া বসিলাম।

পরক্ষণেই খোলা জানালা দিয়া একটা কালো কুচকুচে ভোমরা পাখার শব্দে আমাদের মগজ ভরিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

ভোমরা টেবিলের উপরের বাতিটাকে একবার প্রদক্ষিণ করিল; তার পর সোঁ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া ছাদে বাধা পাইয়া টপ করিয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ তাহার গুঞ্জন নিস্তব্ধ।

আবার ভন্ করিয়া শব্দ হইল। ভোমরা মেঝে হইতে উঠিয়া একবার বিদ্যুৎবেগে ঘরময় উড়িয়া বেড়াইল। তার পর আমাদের কানের পাশ দিয়া ছুটিয়া গিয়া স্নুমধ্যুলা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার গুঞ্জন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে মিলাইয়া গেল।

শিকদার উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দুটা পাগলের মতো। প্রায় চিৎকার করিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন!—আমি একটা অভিসম্পাত। আর কখনও আমার দেখা পাবেন না!"—বলিয়া ওভারকোট ও টুপি ফেলিয়াই ঝড়ের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমরা তিন বন্ধু বিহ্বল জিজ্ঞাসুভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। বুকের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল।

তিন দিনের মধ্যে কাহাকে যাইতে হইবে?

দেখা হবে

ভূপতির স্ত্রী স্মৃতিকণার মৃত্যুকালে আমি [illegible] শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। কেবল ডাক্তার বলিয়া নয়, ভূপতি [illegible]র বন্ধু।

স্মৃতিকে কঠিন রোগে ধরিয়াছিল। আমি নিজের হাতে চিকিৎসার ভার রাখি নাই, কলিকাতার সব বড় বড় ডাক্তারই তাহাকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই বাঁচানো গেল না।

মৃত্যুর রাত্রে শয্যাপার্শ্বে কেবল আমি আর ভূপতি ছিলাম। তেতলার প্রকাণ্ড শয়নকক্ষে দুইটি বড় বড় বৈদ্যুতিক গোলক জ্বলিতেছিল। ঘরের মাঝখানে একটি পালঙ্কের উপর শুইয়া স্মৃতি; ভূপতি আর আমি শয্যার দুই পাশে বসিয়া রোগিণীর মুখের পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।

স্মৃতির গলা পর্যন্ত সিল্কের চাদর দিয়া ঢাকা, মুখখানি শুধু খোলা। মুখ দেখিয়া মনে হয় না, গত তিন মাসে নৃশংস রোগ তাহার চব্বিশ বছরের সবল সুস্থ দেহটাকে কুরিয়া কুরিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। টুলটুলে মুখ, মুদিত চোখ দুটি যেন সুর্মা-আঁকা, চুলগুলি মুখখানিকে ঘিরিয়া মণ্ডল রচনা করিয়াছে। দেখিয়া বোঝা যায় না মৃত্যু আসন্ন।

স্মৃতি আজ রাত্রি দশটার পর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞান নাই। আমি মাঝে মাঝে নাড়ী দেখিতেছি, নাড়ী ভাল নয়। এই অবস্থাতেই বোধহয় শেষরাত্রে কোনও সময় তাহার মৃত্যু হইবে। এখন রাত্রি একটা।

শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছিলাম। দশ বৎসরের চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অনেক মৃত্যু দেখিয়াছি, কিন্তু আজ মনে হইতেছে স্মৃতির মৃত্যু যেন অন্য মৃত্যু হইতে পৃথক। তাহার কারণ বোধহয় এই যে, ভূপতি আমার প্রিয়তম বন্ধু, তাহাকে আমি অন্তরে বাহিরে চিনি। সে বড় ব্যবসায়ী,

অনেক টাকার মানুষ; কিন্তু মনের মধ্যে সে একেবারে অসহায়। অপরপক্ষে স্মৃতির মতন এমন পরিপূর্ণরূপে সংসারী মেয়ে আমি আর দেখি নাই। সংসারকে সুমধুর করিয়া তুলিবার মন্ত্র সে জানিত। দুইজনে মিলিয়া সুখের নীড় রচনা করিয়াছিল; ভূপতি স্মৃতির হাতে নিজের জীবন তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। তাহাদের পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনকে একটি অখণ্ড কাব্য বলা চলে, একদিনের জন্যও ছন্দপতন হয় নাই। তারপর বজ্রাঘাতের মত এই রোগ। একটা সন্তানও নাই। স্মৃতির মৃত্যুতে পৃথিবীর আর কোনও ক্ষতি হোক বা না হোক, ভূপতির জীবনটা ছারখার হইয়া যাইবে।

রাত্রি তিনটার সময় স্মৃতি চক্ষু মেলিল। দৃষ্টিতে জড়তা নাই, অস্পষ্টতা নাই; ভূপতির মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সহজ স্বাভাবিক স্বরে কথা বলিল। তাহার এই স্বর অনেকবার শুনিয়াছি, হলফ্ লইয়া বলিতে পারি তাহাতে বিকারজনিত প্রলাপের চিহ্নমাত্র ছিল না। সে বলিল,—"একশিলা নগরীতে আবার দেখা হবে।"

ভূপতি তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যগ্র-বিস্মিত প্রশ্ন করিল,—"কী—কী বললে?"

স্মৃতি আর কথা বলিল না, আরও কিছুক্ষণ ভূপতির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। আমি তাহার নাড়ীতে হাত দিলাম। নাড়ী কয়েকবার ক্ষীণভাবে স্ফুরিত হইয়া থামিয়া গেল।

স্মৃতি মরিয়া গিয়াছে কিন্তু আমার মনে একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। একশিলা নগরীতে আবার দেখা হবে। ইহা মৃত্যুকালের উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ নয়; মানুষ যেমন রেলের স্টেশনে ট্রেন

ছাড়িবার পূর্বে প্রিয়জনকে বলে—অমুক দিন আবার দেখা হবে, এ সেই ধরণের উক্তি। একশিলা নগরী বলিয়া কি কোনও স্থান আছে? কখনও নাম শুনি নাই। আবার দেখা হবে—একথার অর্থ কি? মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কেহ যদি বলে, আবার দেখা হবে, তবে তাহার কী অর্থ হয়? পরলোক পুনর্জন্ম আমি মানি না। স্মৃতি আধুনিকা ছিল, কিন্তু হয়তো মনে মনে এই সব কুসংস্কার পোষণ করিত; মৃত্যুকালে মনের বাসনা ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে দেখা দিয়াছিল; কিন্তু স্মৃতির কণ্ঠস্বরে হৃদয়াবেগের বাষ্পটুকু ছিল না। তাছাড়া—একশিলা নগরীতে কেন? এই অশ্রুতপূর্ব নামটা স্মৃতি কোথা হইতে পাইল!

স্মৃতির মৃত্যুর পর ভূপতির সঙ্গে কয়েক মাস দেখা হয় নাই। তাহার বাড়িতে গিয়া দেখা পাই নাই। স্মৃতির কথা মন হইতে সরাইয়া রাখিবার জন্যই বোধকরি সে ব্যবসায়ে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছিল। বাড়িতে খুব কমই থাকিত, এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইত। একবার শুনিলাম সে প্লেনে বিলাত গিয়াছে।

মাস দুয়েক পরে হঠাৎ একদিন আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। শুষ্ক রুক্ষ চেহারা, রোগা হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম,—"কোথায় ছিলি এতদিন? মড়ার মত চেহারা হয়েছে, অসুখ-বিসুখ করে নি তো?"

ভূপতি আমার প্রশ্নের জবাব দিল না; আমার স্ত্রীর সহিত কিছুক্ষণ রঙ্গ-রসিকতা করিল, চা ও জলখাবার ফরমাস দিল। স্ত্রী প্রস্থান করিলে আমার পানে কাতরচক্ষে চাহিয়া বলিল,—"ভাই, আর তো পেরে উঠছি না, একটা কিছু উপায় কর্।"

"কি উপায় করব? কিছুতেই ভুলতে পারছিস্ নে?"

"না। যতদিন সে বেঁচে ছিল ততদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম। তার কথা

ভাববার দরকার হত না, সেই অষ্টপ্রহর আমার ভাবনা ভাবত। এখন—তার চিন্তা অষ্টপ্রহর আমার ঘাড়ে চেপে আছে।”

“এতে চিন্তার কি আছে? একদিন তো ভুলতেই হবে। মনকে শক্ত কর, মনের রাশ ছেড়ে দিস্‌নে।”

“সে চেষ্টা কি করিনি? কিছুতেই কিছু হল না।—মরবার সময় কী যে একটা কথা বলে গেল—একশিলা নগরীতে দেখা হবে। তুই কিছু মানে বুঝতে পেরেছিস্‌?”

“না। হয়তো বোঝবার মত মানে কিছু নেই। তুই ও নিয়ে মাথা ঘামাস্‌নি।”

ভূপতি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিল,—“একশিলা নগরী। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ বলতে পারেনি; কিন্তু আমার বিশ্বাস কোথাও না কোথাও একশিলা নগরী আছে।”

জিজ্ঞাসা করিলাম,—“একশিলা নগরীর নাম স্মৃতি আগে কখনও তোর কাছে করেছিল?”

“কখ্‌খনো না।”

অতঃপর দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্ত্রী আসিয়া চা ও জলখাবার রাখিয়া গেলেন, ভূপতি নীরবে জলযোগ সম্পন্ন করিল। আমি বলিলাম,—“ভূপতি, আয় তোর শরীরটা পরীক্ষা করে দেখি। শরীরে রোগ থাকলে মনও অসুস্থ হয়ে পড়ে।”

সে বলিল,—“দূর! শরীর আমার দিব্যি আছে।”

বলিলাম,—“তবে আবার বিয়ে কর্‌। স্মৃতিকে তুই কত ভালবাসিস্‌ আমি জানি, তাকে ভুলে যেতে বলছি না; কিন্তু এভাবে জীবনটা নষ্ট করে ফেলার কোনও মানে হয় না। আমার কথা শোন্‌, আবার বিয়ে কর্‌।”

সে বলিল,—"তুই পাগল। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা কি আমি করিনি। মদ খেয়ে দেখেছি, লোচ্চামি করবার চেষ্টা করেছি; কিন্তু আমার দ্বারা হল না। তোর কথায় একটা মেয়েকে বিয়ে করে কি তার জীবন নষ্ট করে দেব?"

"তবে কি করবি?"

"তা জানি না।" সে উঠিয়া দাঁড়াইল—"আচ্ছা আজ চলি, আবার দেখা হবে।"

দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়া সে থামিয়া গেল, তারপর হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"এই খ্যাথ্, আমিও বলছি আবার দেখা হবে; কিন্তু আমার বলার একটা মানে হয়। স্মৃতি কেন বললে?"

আমি নিরুত্তর রহিলাম। ভূপতি চলিয়া গেল। তারপর তিন মাস আর তাহার দেখা পাইলাম না।

* * *

শীতের মাঝামাঝি ভূপতি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইল, বলিল,—"চল্, বেড়াতে যাবি?"

"বেড়াতে! কোথায়?"

"ভারতবর্ষে বেড়াবার জায়গার অভাব! চল্ কাশ্মীর যাই।"

"এই শীতে কাশ্মীর!"

"তবে রাজপুতনা কিংবা দক্ষিণে যাওয়া যাক। দক্ষিণটা দেখা হয়নি। যাবি? সব খরচ আমার।"

দোনা-মনা করিয়া রাজি হইলাম। ভূপতির যেরূপ চেহারা হইয়াছে, শীতের সময় দেশে বিদেশে বেড়াইলে শরীর সারিতে পারে। মনটা বোধহয় আস্তে আস্তে সুস্থ হইয়া আসিতেছে কারণ স্মৃতির উল্লেখ একবারও করিল না। তবু তাহাকে একলা যাইতে দেওয়া উচিত নয়,

একলা থাকিলেই তাহার মন স্মৃতির কাছে ফিরিয়া যাইবে। এদিকে আমার গৃহিণী কিছুকাল যাবৎ বাপের বাড়ি যাইবার জন্য বায়না ধরিয়াছিল। শীতের সময় রোগীর সংখ্যাও বেশী নয়। সুতরাং মাসখানেকের জন্য ভ্রমণে বাহির হইবার বিশেষ বাধা নাই।

সাত আট দিনের মধ্যে গোছগাছ করিয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রেলের প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের মত এমন আরামের ভ্রমণ আর নাই। ইহার কাছে এরোপ্লেন জেট্‌প্লেন তুচ্ছ।

দক্ষিণে অনেক প্রসিদ্ধ স্থান দেখিলাম—মহীশূর বাঙ্গালোর উটি। প্রত্যেক স্থানে দুইচারি দিন বাস করিতেছি, আবার চলিতেছি। ভূপতির শরীর দ্রুত সারিয়া উঠিতেছে, মনের উপর হইতেও কালো ছায়াটা সরিয়া যাইতেছে। আশা হইতেছে ভ্রমণের শেষে সুস্থ সহজ মানুষটাকে আবার পাওয়া যাইবে।

বেজওয়াড়া হইতে কাজিপেটের লাইনে একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। ভূপতি হঠাৎ নামিয়া পড়িল—"আয়, এখানে যাত্রাভঙ্গ করা যাক্।"

এখানে যাত্রাভঙ্গের কোনও প্রস্তাব ছিল না; কিন্তু ভূপতি পূর্বেও দুই-একবার এরূপ করিয়াছে, অজ্ঞাত অখ্যাত স্থানে নামিয়া পড়িয়াছে। আপত্তি করিলাম না। আমাদের খেয়াল-খুশীর ভ্রমণ, যেখানে ইচ্ছা নামিয়া পড়িলেই হইল। নেহাৎ যদি এস্থানে হোটেল বা ধর্মশালা না থাকে তখন রেলের ওয়েটিং রুম আছে।

প্রস্তরফলকে স্টেশনের নাম দেখিলাম—ওরঙ্গল্।

শহরটি ছোট, খুব পরিচ্ছন্ন নয়। তবে পাথুরে দেশের শহর পুরানো হইলেও সহজে নোংরা পঙ্কিল হইয়া উঠিতে পায় না। একটি হোটেল

আছে, আমরা তাহাতে গিয়া উঠিলাম। হোটেলের দ্বিতল হইতে শহরের পার্বত্য পরিবেশ দেখা যায়। সমস্ত দাক্ষিণাত্য যে একটি বিপুলকায় অধিত্যকা, দক্ষিণে পদার্পণ করা অবধি তাহা ভুলিবার সুযোগ পাই নাই।

আর একটি কথা ভুলিবার উপায় নাই: বাঙালীর সর্বত্র গতি। বাঙালীর 'কুনো' বদনাম আছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অতি নগণ্য অজ্ঞাত-নামা স্থানে গিয়া দেখিয়াছি দুই একটি বাঙালী বিরাজ করিতেছে, অপরিচিত কণ্ঠে বাংলা ভাষা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি। কেহ চাকরি করিতে আসিয়াছে, কেহ ব্যবসায় উপলক্ষে। বাঙালীর অগম্য স্থান নাই।

ওরঙ্গলেও তাহার ব্যত্যয় হইল না। কোট-প্যাণ্টুলন পরা জিরাফের মত একটি লোক হোটেলে বাস করিতেছিলেন, জানা গেল তিনি বাঙালী। তিনি একজন প্রত্নবিৎ খুব মিশুক লোক নন। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক, পাছে তাঁহার আবিষ্কৃত প্রত্নবিষয়ক তত্ত্ব কেহ চুরি করিয়া নিজের নামে ছাপিয়া দেয় তাই তিনি সহজে কাহারও সহিত কথা বলেন না, বলিলেও অতি সন্তর্পণে বলেন; কিন্তু সে যাক।

বৈকালে আমরা পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলাম। দর্শনীয় বিশেষ কিছু নাই, তবু যখন আসিয়াছি তখন ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা উচিত। অবশেষে একটি মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, গঠন গতানুগতিক নয়। একটি লোককে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম মন্দিরের নাম সহস্রস্তম্ভ মন্দির। অতগুলা না হইলেও অনেকগুলা স্তম্ভ আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কতদিনের পুরনো মন্দির?"

লোকটি বলিল,—"পৃথিবী সৃষ্টি হবার আগে থেকে আছে।"

খুবই পুরাতন বলিতে হইবে। ভূপতির দিকে চাহিয়া দেখি, সে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া মন্দির দেখিতেছে, চোখে বিস্ময়াহত অপলক দৃষ্টি।

বলিলাম,—"কি হল?"

সে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"এ মন্দির আমি আগে দেখেছি।"

"অ্যাঁ! কোথায় দেখ্‌লি?"

"তা জানি না—কিন্তু দেখেছি।"

"বোধহয় ফটো দেখেছিস্‌।"

"ফটো—। কি জানি—।"

যখন ফিরিয়া চলিলাম তখনও তাহার চোখ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

হোটেলে ফিরিয়া চায়ের ঘরে গেলাম। এখানে চা কেহ খায় না, কফির রেওয়াজ। দেখিলাম অদূরে বাঙালী ভদ্রলোকটি নাক সিঁটকাইয়া কফি পান করিতেছেন। আমরা ব্যথার ব্যথী, সহজেই ভাব হইয়া গেল। ভদ্রলোকের নাম সুরেশ পাকড়াশী। আমরা নিজেদের পরিচয় দিলাম। চা ও কফির আপেক্ষিক মহিমা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কতদিন এখানে এসেছেন?"

পাকড়াশী বলিলেন,—"তা প্রায় মাসখানেক হতে চলল।"

"কাজে এসেছেন বুঝি?"

"না—হ্যাঁ—না, কাজ এমন কিছু নয়, বেড়াতে এসেছিলাম। শহরটা প্রাচীন—হিন্দু আমলের—আগে নাম ছিল বর্ণকুল, এখন ওরঙ্গলে দাঁড়িয়েছে। ভাবলাম, দেখি যদি কিছু পাওয়া যায়।"

"ও,—আপনি প্রত্নবিৎ। কিছু পেলেন?"

ভদ্রলোক হঠাৎ শামুকের মত অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গেলেন। "কিছু

না” বলিয়া সন্দিগ্ধভাবে তাকাইলেন। তাঁহার বাক্যস্রোতে ভাটা পড়িল; দুই চারবার আমার কথায় হুঁ হাঁ করিয়া এক সময় উঠিয়া গেলেন। তাঁহার বিচিত্র ভাবগতিক তখন বুঝিতে পারি নাই।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া দেখি ভূপতি শয়নঘরের জানালা খুলিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। আমিও উঠিয়া গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলাম। সে বলিল,—“গ্যাখ্, উটের কুঁজের মত ওই পাহাড়টা—ওটা আমি আগে দেখেছি।”

বলিলাম,—“আগে দেখেছিস্ মানে কি? কতদিন আগে?”

সে বলিল,—“তা জানি না; কিন্তু—পাহাড়টা আগে আরও বড় ছিল। চেহারা ঠিক আছে, একটু যেন ছোট হয়ে গেছে।”

বলিলাম—“আগে ফটো দেখেছিলি। ছবিটা অবচেতন মনের মধ্যে ছিল, পাহাড় দেখে বেরিয়ে এসেছে। ও রকম হয়।”

ভূপতি কিছু বলিল না, দূরে উটের মত পাহাড়টার দিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চাহিয়া রহিল।

তারপর ওরঙ্গলে তিন চার দিন কাটিয়া গেল। আমার মনটা উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। এখানে দ্রষ্টব্য কিছু নাই, দীর্ঘকাল বসিয়া থাকার কোনও অর্থ হয় না; কিন্তু ভূপতির কী হইয়াছে জানি না, সে মোহাক্রান্ত ভাবে এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে এখান হইতে গা তুলিবার কথা বলিলে শুনিতে পায় না। তাহার মনের মধ্যে রহস্যময় একটা কিছু ঘটিতেছে। আমি সবিশেষ নির্ণয় করিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম।

ইতিমধ্যে পাকড়াশী মহাশয়ের সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি যদিও আমাদের এড়াইয়া চলিতেন, তবু মাঝে মাঝে বাংলা ভাষায় কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না। আমরাও প্রত্নতত্ত্ব

সম্বন্ধে তাঁহার দুর্বলতা বুঝিয়াছিলাম, তাই ও প্রসঙ্গ যথাসাধ্য বাদ দিয়া কথা বলিতাম।

আরও কয়েকদিন নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটিয়া যাইবার পর আমি মরীয়া হইয়া উঠিলাম, বলিলাম,—"ওরঙ্গলে কি মধু পেলি তুই জানি না, কিন্তু আমি আর থাকছি না। একমাস হয়ে গেছে, আমাকে এবার ফিরতেই হবে।"

সমস্তদিন ঝুলোঝুলির পর রাত্রিকালে তাহাকে রাজি করিলাম, পরদিন বিকালের গাড়িতে দুইজন যাত্রা করিব। সে বলিল,—"ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু তোর যখন এত তাড়া—চল্। আমি কিন্তু আবার আসব।"

পরদিন সকালবেলা চাকর ঘরে চা দিয়া গেল, দুইজনে একত্র বসিয়া পান করিলাম। প্রাতঃরাশ শেষ করিয়া ভূপতি ইজি-চেয়ার জানালার কাছে টানিয়া লইয়া বসিল। আমি বলিলাম,—"চল্ না স্টেশনে খবর নিয়ে আসি, রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে কিনা।"

সে বলিল,—"তুই যা, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।"

আমি বাহির হইলাম। জীবিতাবস্থায় ভূপতির সঙ্গে এই শেষ দেখা। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিলাম, তখনও সে সেই চেয়ারে বসিয়া আছে, মাথাটা পিছন দিকে হেলান দেওয়া। চোখ দুটো বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া আছে। চোখে এবং মুখে কী অনির্বচনীয় বিস্ময়ানন্দ তাহা বর্ণনা করা যায় না। যেন প্রিয়জনকে বহুদিন পরে দেখার শুভ মুহূর্তে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

* * * *

আমার মানসিক অবস্থার কথা বলিব না।

ভূপতির অন্ত্যেষ্টি করিলাম। আমিই বোধ হয় তাহার সবচেয়ে

নিকট আত্মীয়, কারণ আমার হাতের আগুন তাহার দেহটা ছাই করিয়া দিল। কাহাকেও খবর দিতে পারি নাই, ঘনিষ্ঠ আপনার জন তাহার নাই, শুনিয়াছি এক ভাগিনা উত্তরাধিকারী ; কিন্তু ভাগিনার ঠিকানা জানি না।

দেশে ফিরিয়া চলিয়াছি। সঙ্গে চলিয়াছেন পাকড়াশী মহাশয়। বিপদের সময় তিনি দূরত্ব রাখেন নাই, বুক দিয়া পড়িয়া সাহায্য করিয়াছেন। তারপর একসঙ্গে ফিরিতেছি।

ভূপতির মৃত্যু সম্বন্ধে একটা গভীর রহস্য মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমি ডাক্তার, আমি জানি তাহার দেহে এমন কোনও রোগ ছিল না যাহাতে সে হঠাৎ মরিয়া যাইতে পারে। তবে এ কী হইল ? স্মৃতির কথা বারবার মনে পড়িতে লাগিল। সে বলিয়াছিল—একশিলা নগরীতে দেখা হবে ; কিন্তু—

পাকড়াশী মহাশয় একথা সেকথা বলিয়া আমার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ভাবিয়াছেন আমি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।

হঠাৎ একসময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সুরেশবাবু, আপনি পণ্ডিত মানুষ একশিলা নগরী কোথায় জানেন ?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"জানি বৈকি। ওরঙ্গলের প্রাচীন নাম একশিলা।"

"অ্যাঁ—তবে যে সেদিন বলেছিলেন বর্ণকুল !"

"বর্ণকুলও একটা নাম। আর একটা নাম একশিলা। কেন বলুন দেখি ?"

কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম, তারপর স্মৃতির মৃত্যুকালীন কাহিনী বলিলাম। এবার পাকড়াশী মহাশয় বিস্মিত হইলেন, বলিলেন,—"তাই

নাকি! ভারি আশ্চর্য তো! ইতিহাসে পড়েছি দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের জীবনে এই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল। কালানল নামে এক ভারতীয় সাধু—”

তিনি সোৎসাহে বলিয়া চলিলেন কিন্তু সব কথা আমার কানে পৌঁছিল না। আমি ভাবিতে লাগিলাম—মৃত্যুকালে কি মানুষ ভূত-ভবিষ্যৎ দেখিতে পায়? স্মৃতি অনাগত ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়াছিল? ওরঙ্গলে ভূপতির মৃত্যু হইবে তাহা জানিতে পারিয়াছিল? আবার ওরঙ্গলের প্রাচীন নাম একশিলা তাহাও সে জানিয়াছিল? অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুই দিকেই তাহার মুমূর্ষু প্রাণ প্রসারিত হইয়াছিল? ভূপতির চোখেও ওরঙ্গল চেনা চেনা ঠেকিয়াছিল। তবে কি কোনও সুদূর অতীতে ভূপতি ও স্মৃতি একশিলা নগরীর নাগরিক নাগরিকা ছিল?

বুঝি না—কিছু বুঝি না। অগাধ অন্ধকারের মধ্যে খদ্যোতকণার মত বুদ্ধি-দীপ জ্বালিয়া কেবল বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী 'চুয়াচন্দন' সম্বন্ধে বলিতেছেন—

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চুয়াচন্দন' ছয়টি গল্পের সমষ্টি। রক্তখদ্যোত, কর্তারকীর্তি ও মরণ-ভোমরার উপজীব্য বর্তমান কালের জীবন হইতে গৃহীত। বাকি তিনটিকে ঐতিহাসিক গল্প বলা যাইতে পারে।

শরদিন্দুবাবুর প্রধান গুণ ঐতিহাসিক কল্পনা। বহু দূরকালের সামান্য কয়খানা ঘটনার কংকালের মধ্যে তিনি প্রতিভার মন্ত্রবলে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন। এ শক্তি প্রচুর পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের ও কিয়ৎ পরিমাণে রমেশচন্দ্রের ছিল। তৎপরবর্তী লেখকদের মধ্যে এ শক্তি দেখি নাই। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ারের এক-আধখানা অস্থির ভগ্নাংশ পাইলে সমগ্র জন্তুটির আকৃতি সংগঠন করিতে পারেন: কিন্তু ঐতিহাসিক কল্পনা তার চেয়েও বিস্ময়কর শক্তি। ইহার বলে ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করা যায়। শরদিন্দুবাবুর এই শক্তি আছে। তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলে সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

'বাঘের বাচ্ছা' গল্পে কিশোর শিবাজীর চিত্র পাওয়া যায়। কিশোর শিবাজীকে আমরা কোথাও দেখি নাই। শিবাজীর শরীরের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য রকমে বস্তুগত। শিবাজীর দেহের উর্ধ্বার্ধ যে নিম্নার্ধের অপেক্ষা সবল ও পুষ্ট ছিল, ইহা শরদিন্দুবাবু কোথাও

পড়িয়াছেন কিনা জানি না; কিন্তু শিবাজীর অশ্বারূঢ় চিত্র দেখিলেই এই কথাটি মনে হয়। বোধ হয় ইহা শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র রাজ্যেরও প্রতীক। শিবাজীর মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যেই মহারাষ্ট্র রাষ্ট্র ভাঙিয়া পড়িল; তাহার নিম্নার্ধ বা ভিত্তি অস্পষ্ট ছিল, ইহাই বোধ করি তাহার সবচেয়ে বড় কারণ। এই গল্পে আমরা দেখিতে পাই শিবাজীর human জ্ঞান ছিল। বোধকরি অধিক বয়সেও তিনি এ শক্তি হারান নাই। নতুবা আওরংজেবের কয়েদ হইতে সন্দেশের ঝুড়ি করিয়া পালাইবার বুদ্ধি তাঁহার মনে আসিত না।

'রক্তসন্ধ্যা' ও 'চুয়াচন্দন' গল্প দুইটি আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে। রক্তসন্ধ্যা ভাস্কো-ডা-গামার আমলের গোয়া নগরের একটি কাহিনী। সেই সময়ের গোয়া নগর এবং তথাকার লোকজন এমন জীবন্তভাবে লেখক আঁকিয়াছেন যে তাহাকে প্রশংসার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। হয়তো এ সব তথ্য তিনি ইতিহাস হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু এ প্রাণ তো ইতিহাসের গ্রন্থে ছিল না।

কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়ের, গল্পের যে ফ্রেমটির মধ্যে এই গোয়া নগরের কাহিনীকে তিনি আঁটিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার এক মাংস-বিক্রেতা ও গোয়া-নগর হইতে আগত এক পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গির মধ্যে খুনাখুনীকে লেখক অপূর্ব প্রতিভাবলে বহু শতাব্দীর পূর্বেকার ভাস্কো-ডা-গামা ও মির্জা দাউদের সঙ্গে জড়িত করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি বলে, ইহা অসম্ভব, সংস্কার বলে—সম্ভব হইতেও পারে। বিজ্ঞান বলে, ইহা মিথ্যা; আর্ট বলে, ইহা সত্য। লেখক গল্প লেখায় আর্টের সাহায্যেই ইহা সত্য করিয়া তুলিয়াছেন, পড়িবার সময়ে ইহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই।

'চুয়াচন্দন' চৈতন্যদেবের আমলের নদীয়ার একটি কাহিনী। যেমন

রোমান্টিক তেমনি বাস্তব; কিন্তু ইহার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে কিশোর চৈতন্যের চিত্রটি, চৈতন্যদেবের যে মুণ্ডিতমস্তক কৌপীনসম্বল মূর্তির সঙ্গে আমরা সচরাচর পরিচিত, এ চিত্র সে চিত্র নয়। এ সেই দুর্দান্ত বিদ্বান, মূর্খ পণ্ডিতদের মূর্তিমান ভয় স্বরূপ, দৈব প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, একডুবে গঙ্গাগর্ভ-নিমজ্জিত-পণ্ডিতের টিকি ধরিয়া টানিয়া তোলা, প্রচুর হাস্যে প্রগল্‌ভ সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী চৈতন্যদেবের চিত্র। চৈতন্যদেব যে এমন ছিলেন তাহা কোন কোন বৈষ্ণব লেখকের জীবনী হইতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্টভাবে সে ছবি দেখি নাই। যে চৈতন্য একদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, তিনি আবার একদিন অন্ধকার রাত্রে মাঝগঙ্গায় চন্দনের সহিত চুয়ার রাক্ষস-বিবাহ দিয়াছিলেন এমনতর মিথ্যা-সত্য ইহার আগে পড়ি নাই। যাহারা চৈতন্যদেবের গতানুগতিক চিত্র দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা এ দৃশ্য দেখিলে চৈন্যদেবের ভক্ত হইয়া উঠিবেন, আশা করিতেছি।

এই কাহিনীটিতেও তৎকালীন তান্ত্রিক দেশাচারের চিত্র সুষ্ঠুভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। শরদিন্দুবাবুকে অনুরোধ তিনি গল্পটিকে নাটকে পরিণত করুন। ইহার মধ্যে যথার্থ নাটকীয় উপাদান আছে।

বর্তমানকালের উপজীব্য যাহাদের বিষয়বস্তু এমন গল্পগুলির মধ্যে 'কর্তার কীর্তি'র জমিদার হৃষীকেশবাবুর চিত্রটি বড়ই উপভোগ্য। প্রাচীন-কালের একজন জমিদারের ইনি type। রাগিলে ইনি আসবাব ভাঙিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কাচের গেলাস ভাঙিলে ইহার রাগ কমিয়া আসে। হৃষীকেশবাবু রাগে অন্ধ হইয়া টেবিল চেয়ার ভাঙিয়া বেড়াইতেছেন, হঠাৎ কেহ হাতের কাছে একটি কাচের গেলাস আগাইয়া দিল। তিন তাহা ভাঙিয়া শান্ত হইলেন। এ চিত্র যেমন সজীব তেমনি সত্য।

'মরণ-ভোমরা' ও 'রক্ত-খদ্যোত' ভৌতিক গল্প। ভূতের গল্পের দুটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ—তাহা ভূতের হওয়া চাই ও গল্প হওয়া চাই। শরদিন্দুবাবু এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। ইহার প্রধান রস—রহস্যের রস। সংস্কার এখানে বুদ্ধির বড় শরীক। শরদিন্দুবাবুর মধ্যে এই রহস্য ঘনীভূত করিয়া তুলিবার শক্তি যথেষ্ট আছে। সেই জন্যই তিনি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস রচনাতেও পারংগম। তাঁহার রচিত 'ব্যোমকেশের ডায়েরি' এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়াছি। পড়িতে পড়িতে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া আর কয় পাতা বাকি আছে দেখিয়া লইয়াছি। অনেকদিন এভাবে বই পড়ি নাই।

এবার হইতে ভোমরা দেখিলেই শরদিন্দুবাবুর কথা মনে পড়িবে, কি জানি তিন দিনের মধ্যে কাহাকে ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে!

ইতিপূর্বে যাঁহাদের সমালোচনা করিয়াছি তাঁহারা সকলেই বিশ্লেষণ-মূলক লেখক। শরদিন্দুবাবু সে পথে যান নাই। তাঁহার গল্প পড়িতে পড়িতে বারংবার ৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়িয়াছে। প্রভাতবাবু যেমন তৎকালীন অন্যান্য লেখক হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন, ইনিও তেমনি আধুনিক সকল গল্প-রচয়িতাদের মধ্যে স্বতন্ত্র। কি ভাষায়, কি সরস বাচন ভঙ্গীতে, কি গল্পের উপজীব্যে। আধুনিক উপন্যাস ঘটনাবিরল, বিশ্লেষণ-বহুল; শরদিন্দুবাবুর গল্প বিশ্লেষণ-বিরল, ঘটনাবহুল। বিশ্লেষণের শক্তি যেমন তিনি দেখান নাই, তেমনি তিনি দেখাইয়াছেন কি করিয়া ঘটনার জাল বুনিয়া যাইতে হয়। একটি বিষয়ে শরদিন্দুবাবু আধুনিকদের মধ্যে অসামান্য, সে তাঁহার অবিরাম narrationএর শক্তিতে।

আর একটি ব্যাপারের জন্য লেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গল্প

বলিতে বসিয়া তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ দিবার অভ্যাস নাই। আজকাল উপন্যাস শুনিয়া নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না তাহার মধ্যে কি পাওয়া যাইবে। ভাষাতত্ত্ব হইতে ভূতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব হইতে মিথুনতত্ত্ব সমস্তই, কেবল গল্প না থাকিতেও পারে। শরদিন্দুবাবুর বই নির্ভয়ে খোলা যাইতে পারে, কারণ কোন তত্ত্ব তাহাতে নাই, আর নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে, গল্প তাহাতে আছেই।

[শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৪৩]

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

—প্রণীত—

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজি

—গল্প ও উপন্যাস—

কানু কহে রাই	২॥০
গৌড়মল্লার	৪৲
কালের মন্দিরা	৩॥০
কালকূট	২॥০
কাঁচামিঠে	২॥০
ছায়াপথিক	৩৲
শাদা পৃথিবী	৩৲
বিষকন্যা	২॥০
ঝিন্দের বন্দী	৩৲
পঞ্চভূত	২॥০

—ডিটেকটিভ উপন্যাস—

দুর্গরহস্য ৩॥০ আদিম রিপু	৩৲
ব্যোমকেশের গল্প	২॥০
ব্যোমকেশের কাহিনী	২॥০
ব্যোমকেশের ডায়েরী	২॥০

—চিত্র-নাট্য—

বিজ[illegible]	২॥০
কানামাছি	২॥০
যুগে যুগে	২॥০
পথ বেঁধে দিল	২॥০

—নাটক—

বন্ধু	১৸০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬